শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল-রহস্য।

শ্রীমহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগ দ্বারা

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয় (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত।
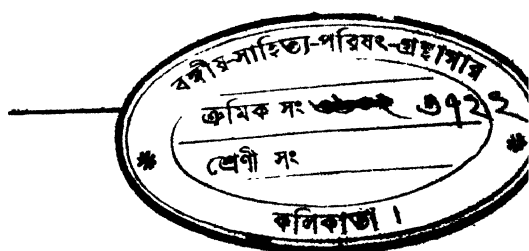
কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীপাঁচুগোপাল আস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫।
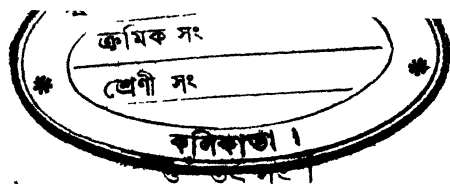
সমর্পণ।

(হিন্দী সংস্করণ হইতে অনূদিত)

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো,
দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয়,
তারয় সংসারসাগরতঃ ॥—শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভু।

গ্রন্থকর্ত্তার আজ্ঞানুসারে আমি এই গ্রন্থরত্ন শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শ্রদ্ধাস্পদ সংরক্ষক, মাননীয় প্রতিনিধি, বন্দনীয় ব্যবস্থাপক, শ্লাঘনীয় সহায়ক ও প্রশংসনীয় সাধারণসভ্য মহোদয়গণ, সনাতন ধর্ম্মানুরাগী-ধর্ম্ম-সভাসমূহের সভ্যবৃন্দ, মাননীয় ধর্ম্মবক্তামণ্ডলী এবং সনাতনধর্ম্মপ্রেমী সজ্জনগণকে সমর্পণ করিতেছি, এবং আশা করিতেছি যে, উক্ত মহাশয়গণ এই গ্রন্থরত্ন দ্বারা আপনাপন জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে লাভবান্ হইবেন।

এই গ্রন্থরত্নের নাম পাঠ করিয়া কোন মহাশয় যেন এরূপ মনে না করেন যে, ইহা মহামণ্ডলের অনুশাসন গ্রন্থ। বাস্তবিক এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশের প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, যিনি অসাধারণ যত্ন দ্বারা ভারতবর্ষের অনেকানেক ধর্ম্মসভা, ধর্ম্মালয়-আদিকে সম্মিলিত করিয়া এই নিয়মবদ্ধ বিরাট্ সভার স্থাপনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার আন্তরিক ভাব বিদিত হয়; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, যিনি আর্য্যজাতির কল্যাণ এবং সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ার্থ বহুকালাবধি বহুবিধ চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহার এই চিন্তাস্রোতে অবগাহন করিয়া শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ, বিশেষতঃ ইহার কার্য্যকর্ত্তাগণ লাভবান্ হইতে পারেন; এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য এই যে, এই গ্রন্থরত্নের প্রচার ও শিক্ষা দ্বারা আর্য্যজাতি স্বকীয় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে।

যদি কোন সজ্জনের এই গ্রন্থান্তর্গত কোন বিষয়ের উপর মতভেদ হয়, তাহা হইলে উহা ব্যক্তিগত মতই মনে করা উচিত, ইহাই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থরত্নের সংস্কৃত, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভাষায় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা রহিল।

নিবেদক
শ্রীমহারাজ নারায়ণ শিবপুরী।
(রায় বাহাদুর)
প্রধানাধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল।
প্রধান কার্য্যালয়।
কাশীধাম।

বিজ্ঞাপন।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥

ইতি শ্রুতি।

সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের অদ্বিতীয় বিরাট্ মহাসভা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান ব্যবস্থাপক এবং দর্শনশাস্ত্রের বহুবিধ গ্রন্থপ্রণেতা জনৈক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী দ্বারা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্য নামক পুস্তক প্রথমে হিন্দী ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের সংস্কৃত এবং মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, উর্দ্দু আদি অন্যান্য দেশভাষার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। বঙ্গদেশনিবাসী সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপকারার্থ ইহার বাঙ্গালা সংস্করণ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বঙ্গপ্রান্তীয় বিভাগ শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের দ্বারা প্রকাশিত হইল।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল কি, সনাতনধর্ম্ম-পুনরভ্যুদয়কর, সমাজহিতকর এবং সদ্বিদ্যাবিস্তারকারী কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া এই মহাসভার স্থাপনা হইয়াছে, আমাদের সমাজ কোন্ রোগে পীড়িত হইয়াছে, উহার চিকিৎসা এবং পথ্য কি, ইত্যাদি অনেক অসাধারণ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহ বৈজ্ঞানিক অখণ্ডনীয় যুক্তির সহিত এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের শাখা ও পোষক সভাসমূহ, সভ্য মহোদরগণ এবং ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয়গণের প্রযত্নে এই গ্রন্থের যত অধিক প্রচার এই বঙ্গদেশে হইবে, ততই সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের হিত সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে এই গ্রন্থরত্নের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই ৺কাশীধামের পবিত্র তীর্থে অনাথ, দীন, বিধবা ও দুঃখিগণের সাহায্যকল্পে স্থাপিত শ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা-দানভাণ্ডারের কোষে প্রদত্ত হইবে।

নিবেদক,

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

(ভারতরত্ন, রাজা, M. A., B. L., C. S. I., উত্তরপাড়া)

অধ্যক্ষ, শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল,

কার্য্যালয়, ১৮, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট,

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলরহস্যের

অধ্যায়-সূচী।

অশুদ্ধ শোধন।

		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯ পৃঃ	২৭ পং	সাত্ত্বিক শক্তিও	সাত্ত্বিক শক্তি ও রাজসিক শক্তিও

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল-রহস্য। *

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্য জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন।

সকল-জীব-ত্রিতাপহারী, পূর্ণশক্তিধারী, সর্ব্বলোক-হিতকারী, ভক্তমনো-মন্দির-বিহারী, সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরির চরণকমলে বার বার প্রণাম।

শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বজীব-হিতকারী ভাবের সদৃশ সনাতন ধর্ম্মও সার্ব্বভৌম-লক্ষ্যযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রজা-হিতকর। এরূপ সনাতন ধর্ম্ম সদা জয়যুক্ত হউন।

---

* এই স্থানে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল নামের স্বরূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিষয়েও কিছু কিছু প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা, শ্রী শব্দ মঙ্গলবাচক। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সময় সদাচারানুকূল মঙ্গলাচরণের রীতি প্রচলিত আছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের পরিমাণ সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মপুত্র ইতি খ্যাতো নদঃ স্রোতস্বিনীপতিঃ।
প্রাচ্যাং যস্য বহন্নান্তে বীচিমালাসমাকুলঃ॥
প্রতীচ্যাং চ নদীনাথঃ সিন্ধুঃ শাখাগণৈঃ সহ।
বহতি প্রোচ্চলদ্বীচিরার্দ্রয়ন্ সততং স্থলীম্॥
উত্তরাং শোভয়ন্নাশাং নগরাজো হিমালয়ঃ।
দৈবীং ভূতিং সমালম্ব্য স্থিতো গৌরীগুরুর্গিরিঃ॥

আর্য্যজাতিই পৃথিবীর আদি-মনুষ্য, আদি-শিক্ষিত, আদি-সভ্য, আদি-শিল্পী, আদি-কবি, আদি-জ্ঞানী, আদি-বিজ্ঞানবিৎ, আদি-ধার্ম্মিক, আদি-যোগী, আদি-

দক্ষিণাং দিশমালম্ব্য বীচিভিস্তাড়য়ন্ তটম্।
রাজতে লবণাম্ভোধিদুর্দ্ধর্ষো লোকদুস্তরঃ॥
সোঽয়ং বিস্তীর্ণভূভাগো নানারত্নবিশোভিতঃ।
নানাবৃক্ষলতাপূর্ণো নানাগিরিনদীযুতঃ॥
নানাপশুগণৈর্জুষ্টো নানাপক্ষিনিষেবিতঃ।
আর্য্যাণাং পুণ্যভূমিঃ সা ভারতং বর্ষমুচ্যতে॥

সনাতন ধর্ম্মের সম্বন্ধে স্মৃত্যাদি-কথিত লক্ষণ যথা,—

বেদপ্রণিহিতং কর্ম্ম ধর্ম্মস্তন্মঙ্গলং পরম্।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥
প্রাপ্নুবন্তি যতঃ স্বর্গমোক্ষৌ ধর্ম্মপরায়ণে।
মানবা মুনিভির্নূনং স ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥
সত্ত্ববৃদ্ধিকরো যোঽত্র পুরুষার্থোঽস্তি কেবলঃ।
ধর্ম্মশীলে তমেবাহুর্ধর্ম্মং কেচিন্মহর্ষয়ঃ॥
যা বিভর্ত্তি জগৎ সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছা হ্যলৌকিকী।
সৈব ধর্ম্মো হি সুভগে নেহ কশ্চন সংশয়ঃ॥
উন্নতিং নিখিলা জীবা ধর্ম্মেণৈব ক্রমাদিহ।
বিদধানাঃ সাবধানা লভন্তেঽন্তে পরং পদম্॥

মহামণ্ডল শব্দের অর্থ মহাসভা। সনাতন ধর্ম্মসংক্রান্ত যে সকল ধর্ম্মসভা, ধর্ম্মালয় প্রভৃতি পুরুষার্থ ব্যষ্টিরূপে আছে, মহামণ্ডল সেই সকলের সমষ্টিরূপিণী বিরাট্ ধর্ম্মসভা।

সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণ যথা,—

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥
ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব॥" ইতি স্মৃতিঃ।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি,
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

ইতি শ্রুতিঃ।

মননশীল, আদি-ভগবদ্ভক্ত, এবং আদি-গুরু। আর্য্যজাতির পবিত্র ভারতভূমিতে অনাদিকাল হইতে অপৌরুষেয় বেদ জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন। এই পূর্ণপ্রকৃতিযুক্ত পবিত্র ক্ষেত্রে অনাদিকাল হইতে অভ্রান্ত আর্ষ দর্শনশাস্ত্রসমূহ জ্ঞানবিজ্ঞান-পথপ্রদর্শক হইয়া রহিয়াছেন। এই একমাত্র কর্ম্মভূমিতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই পবিত্র ভূখণ্ডে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি কুলকামিনীগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই স্বর্গীয় স্থানে শ্রীজনকের ন্যায় গৃহস্থ এবং শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের ন্যায় রাজা আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যসমাজ ও দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীভীষ্মদেবের মত পিতৃভক্ত, পাণ্ডবদিগের মত মাতৃভক্ত, শ্রীলক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃভক্ত, শ্রীকর্ণের ন্যায় দাতা, শ্রীহরিশ্চন্দ্রের মত সত্যপরায়ণ এবং শ্রীযুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মপালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পুণ্যভূমিই শ্রীনারদের মত ভক্তচূড়ামণির লীলাক্ষেত্র, এই ভূমিতে শ্রীবিশ্বামিত্রের মত তপস্বী এবং শ্রীভীমার্জ্জুনের মত বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবানের এই প্রধান লীলাভূমিতে শ্রীবেদব্যাস এবং শ্রীবাল্মীকির ন্যায় গ্রন্থকার, শ্রীমনু এবং শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় বক্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবশিষ্ঠের ন্যায় উপদেশক, শ্রীকপিলদেবের ন্যায় সিদ্ধ এবং শ্রীশুকদেবের ন্যায় জ্ঞানিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব ভারতবর্ষ যে স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মভূমি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যতদিন পর্য্যন্ত এই ভারতভূমিতে পূজ্যপাদ, ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণ বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের পবিত্র ধর্ম্মমার্গের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় নাই। বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে উল্লিখিত বিভূতিসম্পন্ন মহাত্মাদিগের আবির্ভাব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত স্থূলাতিস্থূল হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের অধিকারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে কখনও বিরোধ উপস্থিত হইত না। ঐ সকল মহাত্মার অনুগ্রহে এই ভারতভূমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অধিকারিমাত্রেই স্ব স্ব অধিকারানুসারে সাধনা দ্বারা ক্রমে শ্রেষ্ঠ দশায় উপনীত হইতে পারিতেন। রাজা হইতে নিম্নপ্রজা কিরাত পর্য্যন্ত ধর্ম্মাবতার ঋষিগণের আদেশ এবং অনুশাসন অবনত মস্তকে স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। অধিকার সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বজীব-হিতকরী দৃষ্টিতে সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান

করিতেন। ঐ সুসময়ে একমাত্র অভ্রান্ত সনাতন-ধর্ম্মই পৃথিবীকে পূর্ণরূপে আলোকিত করিয়াছিল।

তাহার পর কলিযুগের প্রারম্ভে ভারতে ধর্ম্মহানি এবং গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল, নৃপতিগণ ধর্ম্মমর্য্যাদা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋষিগণকে উপেক্ষা করত বিপথগামী হইয়া পড়িলেন, পরস্পরের মধ্য হইতে ক্রমশঃ একতা-বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় ভারত-সাম্রাজ্য অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং **পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া পরস্পরে কুক্কুরবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।** সেই সময় পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মহাভারতের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল। কলিকাল—তমঃপ্রধান; কলিকালের অজ্ঞানরূপী বারিদমালা ঐ সময়ে যেরূপ প্রবলবেগে ভারতের ভাগ্যগগন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যদি সেই সময়ে মহাভারতের মহাযুদ্ধ দ্বারা সেই দিগন্তব্যাপী তামসিকতার হ্রাস না হইত, তবে ভারতবর্ষের বিপত্তির সীমা থাকিত না। যদি গীতা-বিজ্ঞান দ্বারা ঐ তমসাচ্ছন্ন আকাশ আলোকিত না হইত, তাহা হইলে দাম্ভিক নরপতিদিগের অত্যাচারে আর্য্যজাতির আর্য্যত্ব পর্য্যন্তও চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ঐ সময় ভারতবর্ষ এবং আর্য্যজাতির অবস্থা নিতান্ত বিপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সেই গভীর দুঃখে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে পূর্ণাবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। জগদীশ্বর কৃপাসাগর; তাঁহারই অনুগ্রহে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধাবসানে ভারতবর্ষে একতা এবং শান্তি সংস্থাপিত হয়। তদবধি কতিপয় শতাব্দী পর্য্যন্ত শান্তিপ্রিয় আর্য্যজাতি আবার শান্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের তিরোভাবকালে শ্রীজগদীশ্বরের অপার অনুকম্পাপ্রভাবে আবার কিছু কালের জন্য তাঁহারা সামান্য সুখের অধিকারী হইলেন। কিন্তু কালের গতি অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কলিকালের করাল গতির মহিমায় আর্য্যজাতির মধ্যে আবার প্রমাদ উপস্থিত হইল; পূজ্যপাদ ঋষিগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ধর্ম্ম-বিপ্লবেরও সূত্রপাত হইল।

অজ্ঞানতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার যতই হ্রাস হইতে লাগিল, ততই তাহারা সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ভাব বিস্মৃত হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদবৃদ্ধি সংঘটিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা

স্ব স্ব লক্ষ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের উৎপাদন আরম্ভ করিতে লাগিল। সেই সময়ে জীবের দুর্গতি দেখিয়া তাহাদিগের গতি-পরিবর্ত্তন-পুরঃসর মুক্তিপথ প্রদর্শন এবং সাংসারিক সুখাভিলাষ বিস্মৃত করাইবার নিমিত্ত দয়ার অবতার শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনু-গ্রহে বহুসংখ্যক জীবের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান— এই তিনটীর সমতারূপী ভিত্তির উপর সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সেই অজ্ঞানতার দিনে উপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ড প্রজাগণের মধ্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় কর্ম্মকাণ্ডের রুচি তাহাদিগের মধ্যে এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, ক্রমশঃ আর্য্য-সন্তান বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের রহস্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তামসিক কর্ম্মেরই পক্ষ-পাতী হইয়া পড়িলেন। কর্ম্মকাণ্ডের ব্যপদেশে বিবিধ ভীষণ অত্যাচার-বহ্নির প্রাবল্যে ভারতভূমি দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। পীড়া কঠিন আকার ধারণ করিলে যেরূপ বিষপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয়, তদ্রূপ সেই ঘোর-প্রমাদ-সময়েও অধিদৈব-ভাবহীন জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজন হওয়ায় শ্রীবুদ্ধ ভগবানের আবির্ভাব হইবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী তৎকালীন প্রজাদিগের পক্ষে হিতকরী হইলেও তাহাতে বৈদিক-মার্গাধিকারী আর্য্যসন্তানগণের কোনরূপ স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি কেবল স্বীয় দয়াভাবেই নিমগ্ন ছিলেন এবং সেই জন্য উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক উদ্দেশ্যসাধন-প্রয়াস ব্যতীত তিনি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। এই কারণে শ্রীবুদ্ধ দেবের তিরোভাবের পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকেরা ঐ ধর্ম্মকে স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ গঠন করিয়া লইলেন। ক্রমে আত্মোদ্ধার-লক্ষ্য পরিত্যক্ত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে বহির্লক্ষ্য এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, ঐ ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বিশেষ বিপত্তিরই কারণ হইয়া উঠিল। শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম আপনারই দোষে স্বীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য অনার্য্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যাচারে পীড়িত হইবার পর আর্য্যগণ মস্তক উন্নীত করিলেন। ঐ সময় দার্শ-নিকশিরোমণি কুমারিল ভট্টাদি ঋষিতুল্য আচার্য্যগণের আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর সুযোগক্রমে ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব হইল। আপনার পূর্ব্বলীলায় যে সকল অভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবার তিনি তাহা পরিপূরণ করিলেন।

প্রভু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব দ্বারা ভারত পুনর্জীবন লাভ করিল, কাল সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিল, গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রসন্ন হইল, দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইল, আকাশস্থিত তারকারাজি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতাপ্রাপ্তিপুরঃসর দেদীপ্যমান হইল, নদী প্রসন্নসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া হ্রদ-সমূহের শোভা সংবর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিল, বন উপবনে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং ওষধিসমূহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পফলে সুশোভিত হইল, এবং ঐ সকল বৃক্ষে বিহঙ্গমকুল গীতিপ্রবাহ উত্থিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, বায়ু শীতল এবং সুগন্ধ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিল, দ্বিজগণের অগ্নি শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সাধুগণের হৃদয় পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের প্রকৃতি এইপ্রকার পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষ বাল্যাবস্থাতেই অদ্ভুত বৈরাগ্যের পরিচয় প্রদান করেন এবং সন্ন্যাসাবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের কল্যাণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ঐশ্বরিক বিভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক অদ্বৈত বৈদিক মার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হিমালয় হইতে ভারতসমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীকে তিনি স্বীয় মতের প্রাধান্য স্বীকার করাইয়া বৈদিক মার্গে প্রবর্ত্তিত করেন এবং ভবিষ্যতে ধর্ম্মমর্য্যাদা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রাখিবার অভিলাষে তিনি ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করেন। তাঁহারই নির্দেশানুসারে পূর্ব্বদিকে মহাতীর্থ জগন্নাথপুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকাপুরীতে শারদা মঠ, দক্ষিণ প্রদেশে শৃঙ্গেরী মঠ, এবং উত্তরে হিমালয়ের পবিত্র-প্রদেশান্তর্গত বদরিকাশ্রমে জোষী মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শক্তি এবং জাতি সকল যে নিয়মিত অনুশাসন-ব্যবস্থা-প্রণালীর (organisation) প্রভাবে এ সময় জগন্মান্য হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীভগবান্ শঙ্করা-চার্য্য প্রভু সেই স্বজাতীয় নিয়মিত ব্যবস্থাপ্রণালীর পুনরুদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। সমস্ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিভাগ শাসন করিবার জন্য তিনি এই চারিটী মঠে চারিজন আচার্য্য স্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহা ঐ চারিজন আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে থাকে।

ভারতবাসীদিগের উপর কৃপাপরবশ হইয়া প্রভু শঙ্করাচার্য্য যে শক্তি প্রয়োগ

করিয়াছিলেন, তাহারই বলে বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজিত ছিল, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে সেই শক্তি শিথিল হইয়া পড়িল, আবার ধর্ম্মহানি সংঘটিত হইল, আবার লোকে সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম, সর্ব্বজীব-হিতকারী ভাব বিস্মৃত হইয়া গেল, পুনরায় গৃহবিবাদানলে ভারত দগ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময় আর্য্য-জাতির মূর্খতাবশতঃ পবিত্র ভারতভূমিতে যবনরাজের আধিপত্য সংঘটিত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে যবন নৃপতিবর্গ এখানে আসিয়া আর্য্য রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা অত্যন্ত শিথিল করিয়া দিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যবনরাজের শাসনাধীন হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-জাতি ধর্ম্ম ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে কখনও পারিয়াছে কি? যে সময় যবন-দিগের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, সেই সময় করুণানিধির কৃপাদৃষ্টি ভারতবাসীর উপর পতিত হইল,—তখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। বিশিষ্টা-দ্বৈত-মতপ্রবর্ত্তক পূজনীয় শ্রীরামানুজাচার্য্য, শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবল্লভাচার্য্য, দ্বৈতাদ্বৈত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মাননীয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, দ্বৈত-মতপ্রবর্ত্তক আরাধ্য শ্রীমাধ্বাচার্য্য এবং যতিবর শ্রীচৈতন্যা-চার্য্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের আবির্ভাব হওয়ায় সনাতন ধর্ম্ম আসন্ন-ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা পাইল। ঐ সকল মহাপুরুষ সেই সময় আর্য্যসন্তানদিগের শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তিসলিল সেচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রফুল্লিত করিলেন। সেই আপৎকালে যদি এই সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের আবির্ভাব না হইত, তবে যবন শাসকদিগের দ্বারা সনাতন-ধর্ম্মের যে অত্যধিক হানি উপস্থিত হইত এবং আর্য্য-সন্তান যে আপনার স্বরূপ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে ধর্ম্মসংস্থাপকদিগের মধ্যে ঋষিতুল্য শ্রীমধুসূদনাচার্য্য, সিদ্ধবর শ্রীনানক, ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীতুলসীদাস, কবিবর শ্রীসুরদাস, যতিবর শ্রীরামদাস স্বামী প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মের রক্ষাকার্য্য সাধনে পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা যবন থাকিলেও একবার সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রবাহ বহিতে লাগিল এবং সেই প্রবাহ দ্বারা মলিনতা বহু পরিমাণে ধৌত হওয়ায় সনাতন ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইল। সেই সময়ে বহু জীবের কল্যাণও সাধিত হইয়াছিল।

সংসারের সমস্ত পদার্থ পরিবর্ত্তন-নিয়মের অধীন। এই নিয়মের অধীনতা-বশতঃ যবন-রাজ্যও বিনষ্ট হইয়া গেল। সে সময়ে যবনরাজগণ একেবারেই রাজ-

ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং ঘোর অত্যাচারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ; সেই সময় হিন্দুদিগের আবার একবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই সময়েই মহারাষ্ট্র এবং শিখরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষা কখনই হইতে পারে না। যবনদিগের দাসত্বকার্য্যে হিন্দুদিগের বহুকাল অতীত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত রাজধর্ম্ম রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহাদিগের ছিল না। তাহার পর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ-রাজ ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করায় প্রজাবর্গ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু আধুনিক ধর্ম্মের মধ্যে সার্ব্বভৌম লক্ষ্য কোথায় ? ইংরাজদিগের শাসন-সময়েও খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের হৃদয়ে বিস্তর আঘাত লাগিয়াছে। তাই পুনরায় তমসাচ্ছন্ন আর্য্যজাতি একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। বর্ত্তমান সম্রাটের রাজধানী বঙ্গদেশে অবস্থিত, সেই স্থানেই সর্ব্বপ্রথমে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার হইয়াছিল। এই নিমিত্ত সনাতনধর্ম্মের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনও বঙ্গদেশ হইতেই আরব্ধ হয়। ঐ সময় যখন লোকে সনাতন-ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক বুঝিতে পারিল যে, আমরা পূর্ণ বলশালী হইলেও আপনাদিগের উপেক্ষার ফলে আপনাদিগের দুর্গতি করিতেছি, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের আক্রমণ হইতে এই দেশকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি তাঁহার তমোগুণবিশিষ্ট ভ্রাতৃগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে "তোমাদিগের সনাতন ধর্ম্মে কোন বিষয়েরই অভাব নাই। তোমাদিগের ধর্ম্মেও এক ব্রহ্মেরই উপাসনা আছে। সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তোমাদিগের ধর্ম্মেও জাতিভেদ নাই, তবে তোমরা কি অভিপ্রায়ে খৃষ্টান হইতেছ ?" তখন সেই স্রোত পুনরায় ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে ঐ অঞ্চলেও রক্ষকের আবশ্যকতা হইয়াছিল, তাই মৌন-ব্রতধারী সন্ন্যাসী দয়ানন্দ সরস্বতীজী আপনার ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই প্রদেশে সেই উপধর্ম্মের স্রোত অবরুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজী বেদের অংশমাত্র মুখ্য রাখিয়া সময়োপযোগী এরূপ নিয়মসমূহ বিধিবদ্ধ করিলেন যে, তাহাতে ভ্রান্ত ভারতবাসীর চিত্ত স্থির হইল। একে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীদিগের ভক্তি আবহমানকাল হইতেই সন্ন্যাসীদিগের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ; তাহার উপর যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদিগেরই রুচি অনুযায়ী ধর্ম্মমার্গও সন্ন্যাসী দ্বারা মিলিল, তখন দেখিতে

দেখিতে বিস্তর আর্য্যসন্তান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার পরিণাম যাহাই হউক—কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পণ্ডিতবর রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এবং যতিবর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজীর প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ, এই দুই মতের দ্বারা সেই আপৎকালে সনাতনধর্ম্ম বিস্তর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদি সেই সময় এই দুই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি না হইত, তবে বর্ত্তমান সময়ে সহস্র সহস্র অসহায় আর্য্য নরনারীকে খৃষ্টধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিতে দেখা যাইত, বিনা কারণেই সহস্র সহস্র নরনারী ভ্রান্তিজালে নিপতিত হইতেন।

ক্রমে যখন ব্রাহ্মসমাজের বহির্দৃষ্টি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যখন সনাতনধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করাই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল, এদিকে আর্য্যসমাজ যখন আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া সনাতনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদিগের প্রিয় শাস্ত্রপুরাণাদির নিন্দা করাই আপনার উদ্দেশ্য স্থির করিল, যখন ইহার ফলে ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহারমধ্যে বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তখন সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তখন তাঁহাদিগের পুনরায় চৈতন্য হইল। তাঁহারা পরস্পর ঐক্য স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগের ধর্ম্মের সম্মান রক্ষাকরণাভিপ্রায়ে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, ধর্ম্মমণ্ডলী, ধর্ম্মমহামণ্ডল এবং ধর্ম্মপরিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্মোদ্ধারক সভাসমূহ স্থাপিত করিয়া পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। ধর্ম্ম-প্রবাহ বহিতে লাগিল। সেই প্রবাহে ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ এই চারিদিকের লোকেরই নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ব্রাহ্মণসন্তানগণ আবার পরিদর্শক এবং উৎসাহদাতার পদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের তেজস্বিনী বক্তৃতাবলী দ্বারা ঘোর-তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে দেখা গেল। সনাতনধর্ম্মের ধর্ম্মাচার্য্য, সংস্কৃত-অধ্যাপক এবং সদ্বক্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মের নবোৎসাহ-প্রবাহ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কার্য্যও বিস্তর হইল, ধর্ম্মপ্রবাহও বহিতে লাগিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা-প্রকার সাময়িক পত্র এবং পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ঐ আধ্যাত্মিক প্রবাহের প্রতিঘাত ইউরোপ এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। যে সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আপনাদের বালসুলভ চঞ্চলতা বশতঃ সনাতন ধর্ম্মকে অজ্ঞানী-

দিগের ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সমাজে অসাধারণ বুদ্ধিমতী পরমবিদুষী শ্রীমতী ম্যাডাম্ ব্লাভাস্‌কী জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশল, তপস্যা এবং বিদ্যাপ্রভাবে ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও বেদ-বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানজ্যোতির বিস্তার করিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে সনাতনধর্ম্মের প্রশংসা করিতে দেখিয়া ভারতবর্ষের ইংরাজী-বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি-দিগের নেত্র উন্মীলিত হইল। তাঁহারাও এই ধর্ম্মপ্রবাহে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। এবং তাঁহারাও আপন পৈতৃক ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা স্বস্ব কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সময়োচিত ধর্ম্মপুরুষার্থ-বৃদ্ধিকার্য্যে তৎপর হইতে লাগিলেন। সরোবরের জল যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, পুষ্পশ্রেষ্ঠ কমলের মৃণালও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু কালপ্রভাবে জল শুষ্ক হইয়া গেলে মৃণাল কখনই ক্ষুদ্র হইতে পারে না; কমলদল ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়, তথাপি উহা ক্ষুদ্র অবস্থা কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের অনুগ্রহে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া আর্য্যসন্তানদিগের মানসিক দৃষ্টি একসময় অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে অধ্যাত্মভাবরহিত পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ইংরাজী-শিক্ষিত বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং ধর্ম্মবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব থাকিলেও তাঁহাদিগের উচ্চ দৃষ্টি কখনই নীচ হইয়া পড়ে নাই। তাই তাঁহারা বিপথগামী হইতেছেন, তথাপি অন্য উপধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অধ্যাত্ম-ভাব যাঁহাদিগের শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয়লোলুপ বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্য শাস্ত্রে কি কখনও তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে? অতঃপর শ্রীমতী ব্লাভাস্‌কী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থিয়োজফিক্যাল্ সোসাইটীর যত্নে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতি শীঘ্রই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে লাগিল। *

বিশেষতঃ শ্রীমতী যে জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, এক সময়ে সেই জাতির দ্বারাই

* থিওজফিক্যাল্ সোসাইটীর তিনটী প্রধান উদ্দেশ্য আছে, যথা,—অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পঠনপাঠন, যোগাদিসাধন এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাবস্থাপন। এই মহাসভার শাখা পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। সেই সকল সভার সংখ্যা বহুশত হইবে। ইউরোপাদি সকল দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যালয় আছে। সমস্ত পৃথিবীর জন্য ইহার প্রধান কার্য্যালয় মান্দ্রাজে এবং ভারতবর্ষের জন্য কাশীধামে অবস্থিত।

আর্য্যসন্তানের স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছিল। এ অবস্থায়, যখন সেই জাতিরই একটী অসাধারণ তেজ এবং বুদ্ধি-সম্পন্না বিদুষীর দ্বারা আপনাদের আর্য্যবিজ্ঞানের অনুকূল উপদেশ আর্য্যসন্তানের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা আত্ম-বিস্মৃতি পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই আপনাদের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন। প্রকত প্রস্তাবে শ্রীমতীর অসাধারণ শক্তি, প্রতিভা ও পুরুষার্থ এবং তাঁহার শিষ্যপরম্পরা দ্বারা যে বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রবাহের উন্নতিসাধন পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সময়ে যোগিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মহারাজের অসাধারণ তেজে অনুপ্রাণিত স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা শ্রীবিবেকানন্দ দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিবাসিগণ উত্তমরূপে ইহা পরিজ্ঞাত হইয়াছিল যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির বিচার এবং ধর্ম্ম-শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে একমাত্র ভারতবর্ষ সর্ব্বকালেই সম্যক্ প্রকারে জগতের আচার্য্যস্থানে উপবেশন করিবার উপযুক্ত।

অনুশাসনের অধীনতা স্বীকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য ; তামসিক, রাজ-সিক অথবা সাত্ত্বিক অধিকারী সকলকেই নিজ নিজ অধিকারানুসারে অনু-শাসনের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। উহার উপেক্ষা করিলে পতন অবশ্য-ম্ভাবী। শাস্ত্রানুশাসন এবং আচার্য্যানুশাসনের অধীনতা ত্যাগ করার জন্যই জগদ্গুরু আর্য্যজাতিরও আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক অধঃপতন হইয়াছে। অজ্ঞানতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মক্রিয়ায় অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মক্রিয়ায় ধর্ম্মবোধ হওয়ার পাপেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধবিপ্লব হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বিদেশীয় জাতির সাম্রাজ্য-স্থাপনেরও এরূপ বহুবিধ কারণ আছে। আর্য্যজাতির কর্ম্মের প্রতি সংযম করিলে ঐ সকল কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, আর্য্য-জাতির স্বধর্ম্মিবিদ্বেষ নিরাকরণ জন্যই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মি-প্রেমী মুসলমান জাতির হস্তে ভারত সমর্পিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুশাসন স্বধর্ম্মি-বিদ্বেষ শিক্ষা দেয় না। কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ আর্য্যজাতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ছল করিয়া স্বধর্ম্মিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের কারণ-সমূহের মধ্যে আর্য্যজাতির এই মহাপাপই এক প্রধান কারণ। ঐরূপে বুঝা যায় যে, আর্য্যজাতির স্বদেশি-বিদ্বেষ-জনিত পাপের নিরাকরণ জন্যই পৃথিবীর মধ্যে

আদর্শ স্বদেশি-প্রেমী ইংরাজ জাতির হস্তে আর্য্যজাতির অনুশাসন ন্যস্ত হইয়াছে। যে সনাতন ধর্ম্ম উদারতার পরা কাষ্ঠায় পূর্ণ, সেই সনাতন ধর্ম্মের ছল করিয়া যখন অধঃপতিত আর্য্যজাতি স্বদেশী হইলেও হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী, বৌদ্ধ, জৈন, বাঙ্গালী, পঞ্জাবী এবং দক্ষিণ ও উত্তরভারতীয় স্বদেশবাসিগণের মধ্যে দ্বেষ উৎপাদনকারী মহাপাপে পতিত হইল, তখন ঐ পাপপ্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ সাম্রাজ্যের স্থাপনা হইয়াছে। এখন আর্য্যজাতির প্রতিক্ষণ নিজকর্ম্মের এই সকল কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ স্মরণ রাখিবার বিষয়। এইরূপ পবিত্র সিদ্ধান্তসমূহের এই সময় আবির্ভাব হইতে লাগিল। পূর্ব্বভারতাধিবাসী, পবিত্রাত্মা, ধার্ম্মিকবর শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ মোহনিদ্রাভঙ্গ-কারী সিদ্ধান্তসমূহের প্রকটন বিষয়ে অগ্রণী হইলেন।

বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস শীর্ষস্থানীয়। অতএব সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণদিগের গুরুস্থানীয়। অধুনা যেপ্রকার গৃহস্থাশ্রমের অধিকারী-দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের উত্তেজনায় সামান্য পুরুষার্থশক্তির আবির্ভাব হই-য়াছে, সেইপ্রকার সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও পরোপকারব্রত অবলম্বন দ্বারা ধর্ম্মোত্তেজনা-প্রবৃত্তির বিশেষত্ব দেখা দিল। প্রতি তিন বৎসরে ভারতের চারিটী প্রসিদ্ধ তীর্থে যে মহাকুম্ভের মেলা হইয়া থাকে, সেই মেলার সমাগম ক্রমশঃ এক এক তীর্থে দ্বাদশ বৎসরে সংঘটিত হয়। সাধু মহাত্মাদিগের সেই অসাধারণ সম্মিলনের দ্বারা লোকহিতকর ধর্ম্মপুরুষার্থের চর্চ্চা বহুলপরিমাণে সাধিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীদিগের মধ্য হইতেও কোন কোন পরোপকারব্রতধারী মহাপুরুষ প্রভূত পরিমাণে কার্য্য করিয়াও দেখাইলেন। সেই সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে শারদা-মঠাধীশ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীস্বামী শ্রীমদ্রাজ-রাজেশ্বর শঙ্করাশ্রম শঙ্করাচার্য্য মহারাজ প্রচারকার্য্যে এবং পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমান্ স্বামী ব্রহ্মনাথ আশ্রমজী মহারাজ বিদ্যাপ্রচার বিষয়ে অনেক কার্য্য করিলেন। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা নবীন উৎসাহে উৎসাহিত ব্রাহ্মণদিগের চিত্তে অল্পাধিক পরিমাণে উৎসাহের দৃঢ়তা হইয়াছে। এই সময়ে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণানন্দ মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কাশীর ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচা-রিণী সভা দ্বারা পূর্ব্বভারত এবং বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রান্তে নানা শাখা-সভা স্থাপন, ধর্ম্মবক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্য এবং ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বিচলিত হিন্দুসন্তানের

শ্রদ্ধা পৈতৃক সনাতন ধর্ম্মের প্রতি প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস বহুল পরিমাণে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইপ্রকার বোম্বাই প্রান্তে শ্রীশারদা-মঠাধীশ আচার্য্য প্রভুর অনুশাসনাধীন থাকিয়া সনাতন-ধর্ম্মপরিষদ্ প্রভৃতি সভা তদঞ্চলস্থ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি পরিবর্ত্তন বিষয়ে বহুল পরিমাণে কার্য্যকারী প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম একমাত্র সংস্কৃত-বিদ্যারূপী ভিত্তির উপর অবস্থিত, শাস্ত্রীয় গ্রন্থই বিদ্যার প্রধান আশ্রয়স্থল। আজ কয়েক সহস্র বৎসর হইতে ভারতে নানা রাজনৈতিক বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব এবং ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় বেদ এবং নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের এক-সহস্রাংশও পৃথিবীতে নাই এবং যে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ অবশিষ্ট আছে, সে সকলের অধিকাংশ প্রায় অপ্রকাশিত অথবা লুপ্ত। সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিরূপী সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ইটাওয়া নগরস্থ পুস্তকোন্নতি সভা অসাধারণ কার্য্য করিয়া দেখাইয়াছেন। এই সময় পঞ্জাবের ধর্ম্মসভা এবং বঙ্গদেশের হরিসভাসমূহ সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষা, সংস্কৃত-বিদ্যাপ্রচার এবং ভগবদ্ভক্তিবিস্তার প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল প্রান্তে সময় সময় বহুল পরিমাণে পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ার্থ এই আনন্দময় এবং শান্তিবর্দ্ধক শুভসময়ে আর্য্যাবর্ত্তান্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত * প্রদেশে কিছু বিশেষ কার্য্য হইল। প্রথম হরিদ্বার তীর্থের মহাকুম্ভ মেলার সময়ে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল-নামক মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয়; তাহার পর ত্রিবেণী তীর্থের মহাকুম্ভ মেলার সময় আশ্রমগুরু সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা নিগমাগম-মণ্ডলী-নামক দ্বিতীয় সভার সৃষ্টি হইল। প্রথম সভা প্রচার কার্য্যে এবং দ্বিতীয় সভা ব্যবস্থা কার্য্যে সফলতা লাভ করিল। অতঃপর কলের্গতাব্দাঃ ৫০০১তে দুইটী পুরুষার্থ এক হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত সু-অবসর প্রাপ্ত হওয়ায়, উল্লিখিত দুইটী সভার সম্মিলনে কলের্গতাব্দাঃ ৫০০২তে † শ্রীমথুরাপুরীর মহাধিবেশনে নিয়মবদ্ধ বিরাট্

* আ সমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বা-দা সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
ইতি মনুঃ।

† কলের্গতাব্দাঃ ৫০০২র অন্তে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে এই বিরাট্ সভার জন্ম হয়।

সভা শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের জন্ম হয়। এই স্বজাতীয় অধ্যাত্ম মহাযজ্ঞের প্রারম্ভ-কার্য্য এই সময়ের বড় বড় সিদ্ধ মহাত্মার উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তবর্ত্তী সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে এই ধর্ম্মকার্য্য আরব্ধ হইয়াছে।

দার্শনিক কবিগণ ভারতবর্ষবিষয়ে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে, যেন শ্রীভগবান্ আপনার পূর্ণশক্তি বিকাশ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীমধ্যে একটী অতি সুন্দর রম্য পুষ্পবাটিকা রূপে ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে কেবল ধর্ম্মরূপী পুষ্পসমূহ বিকসিত হইয়া থাকে এবং মোক্ষরূপী ফলের উৎপত্তি নিমিত্ত জগৎপিতা যেন এই একটীমাত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন *। প্রকৃত পক্ষে, ভারতবর্ষের এই প্রশংসা অত্যুক্তি নহে। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এ কথাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্তের অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণবর্গ দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অধ্যাত্মজ্ঞানের বিস্তার হইয়া মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণ সাধিত হইবে †। প্রাচীনকাল হইতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে। পরন্তু সর্ব্বকালেই ঋষিবাক্যের সফলতা প্রতিপাদনার্থ এই করাল কলিকালের বিকরাল সময়েও ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ বিস্তার করিবার নিমিত্তই যেন এই বিরাট্ সভার সৃষ্টি হইয়াছে। পরম-আনন্দপরিপূর্ণ কৈলাসকাননে শিবশক্তির সম্মিলন হইতে যেপ্রকার পরমপদরূপী মুক্তিফলের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, সেইপ্রকার ত্রিতাপে তাপিত আর্য্যজাতিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপী ফল প্রদানের নিমিত্ত ভারত-কাননে উক্ত ধর্ম্ম-মণ্ডল এবং ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্মিলনের দ্বারা শ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে।

যেরূপ দুইটী পক্ষের সহায়তা ব্যতীত পক্ষী উড়িতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ এই উভয়েরই সহায়তা ব্যতীত জীব অভ্যুদয় অথবা নিঃশ্রেয়স লাভে সমর্থ হইতে পারে না। মহাভারতের মহাযুদ্ধের পর আর্য্য-

* মন্যে বিধাত্রা জগদেককাননং বিনির্ম্মিতং বর্ষমিদং সুশোভনম্।
ধর্ম্মাখ্যপুষ্পাণি কিরন্তি যত্র বৈ কৈবল্যরূপং চ ফলং প্রচীয়তে॥

† এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
ইতি মনুঃ।

জাতির রাজসিক সহায়তা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয় যে, এপ্রকার সর্ব্বপ্রান্তব্যাপী শান্তিময় সু-অবসর অতি অল্প বারই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভুর তিরোভাবের পর সার্ব্বভৌম ধর্ম্মব্যবস্থা করিবার উপযোগী সুসময় এবং সুশাসন দ্বারা স্থায়ী সু-অবসর আর্য্যজাতির পক্ষে বর্ত্তমান সময়েই মিলিয়াছে। ন্যায়পক্ষপাতী বুদ্ধিমান্ নীতিজ্ঞ এবং গুণগ্রাহী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসন দ্বারা অধুনা যে, আর্য্যজাতির পক্ষে আত্মোন্নতি করিবার উত্তম অবসরই উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সনাতন-ধর্ম্মানুসারে রাজা দেবতাবৎ মাননীয়; এই নিমিত্ত এ সময় তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা হইতে বিরত না হইয়া আর্য্যজাতি নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে সকলপ্রকার সাধন এবং অভ্যুদয় সম্বন্ধে অনেকপ্রকার পুরুষার্থ করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এ সময় আর্য্যজাতির শুভাদৃষ্টই উদিত হইয়াছে। কেবল পুরুষার্থপ্রকাশ দ্বারা আত্মোন্নতি করিবার অপেক্ষা আছে। কিন্তু নিয়মপালন ব্যতীত কোনপ্রকার পুরুষার্থেরই সফলতা-প্রাপ্তি অসম্ভব। কেবল অনুশাসনের দ্বারা নিয়ম-রক্ষা হইতে পারে। ধর্ম্মানুশাসনই সফলতা প্রাপ্ত হইবার বীজমন্ত্র; অতএব সনাতনধর্ম্মাবলম্বী সমাজমধ্যে দেশ-কাল এবং অধিকারানুসারে যথাসম্ভব ধর্ম্মানুশাসন-প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং সদ্বিদ্যা-বিস্তার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির অপার অনুগ্রহে এই বিরাট্ সভার উৎপত্তি হইয়াছে।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চিন্তার কারণ।

সদাচারমূলক জাতিধর্ম্মের সহিত জীবের ক্রমোন্নতি এবং অন্তিমকালে মুক্তি পর্য্যন্ত কিপ্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে, শাস্ত্রানুসারে তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। আচারই জাতির মূল; * প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি, গুণ এবং কর্ম্মের ভেদে জাতিসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিমিত্ত সদাচার ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছে এবং আপন আপন জাতি অনুসারে সদাচার প্রতিপালিত হওয়াই জাতিত্বরক্ষার মূল কারণ। আর্য্যজাতির সদাচার শাস্ত্র দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শাস্ত্রই সদাচারের মূল। বেদবাক্যই শাস্ত্রের মূল; কারণ অভ্রান্ত সনাতনধর্ম্মানুসারে বেদ অপৌরুষেয়। কেবল জীবের কল্যাণার্থ শ্রীভগবান্ আপনিই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সনাতন ধর্ম্মে যে সকল শাস্ত্র আছে, সে সমস্তই বেদের অনুযায়ী। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আপনাদিগের অভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা বেদমত প্রতিপাদনার্থ নানা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বেদমতানুযায়ী সমস্ত শাস্ত্রের মূলেই শ্রীবেদ-ভগবান্ বিদ্যমান। যেরূপ মলয়মারুত প্রবাহিত হইলেও অন্তঃসারশূন্য বংশবৃক্ষ চন্দনে

---

* আচারমূলা জাতিঃ স্যাদাচারঃ শাস্ত্রমূলকঃ।
বেদবাক্যং শাস্ত্রমূলং বেদঃ সাধকমূলকঃ॥
ক্রিয়ামূলঃ সাধকশ্চ ক্রিয়াঽপি ফল-মূলিকা।
ফলমূলঃ সুখং দেব সুখমানন্দমূলকম্॥
আনন্দো জ্ঞানমূলং চ জ্ঞানং জ্ঞেয়স্য মূলকম্।
তত্ত্বমূলং জ্ঞেয়মাত্রং তত্ত্বং হি ব্রহ্মমূলকম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং হৈক্যমূলম্ ঐক্যং স্যাৎ সর্ব্বমূলকম্।
ঐক্যং হি পরমেশান ভাবাতীতং সুনিশ্চিতম্।
ভাবাতীতমিদং সর্ব্বং প্রকাশভাবমাত্রকম্॥
ইতি বিজ্ঞানভাষ্যে।

পরিণত হয় না, কিন্তু সেই পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমস্ত সারবান্ বৃক্ষই সুগন্ধি চন্দনে পরিণত হইয়া যায়, তদ্রূপ সাধনবিহীন জড় অন্তঃকরণে ঈশ্বরের নির্ম্মল জ্যোতীরূপী বেদ প্রতিবিম্বিত হয় না। পরন্তু অসাধারণ তপঃ এবং যোগ-সম্পন্ন সাধকের নির্ম্মল হৃদয়ে স্বতঃই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে থাকে। সাধক না হইয়া কেবল ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য ভগবজ্জ্যোতির অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু অসাধারণ তপঃ এবং যোগ-সাধন দ্বারাই সাধকচূড়ামণি মহর্ষিগণের অন্তঃকরণে বেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব সাধকই বেদের মূল। ক্রিয়া করিলেই মনুষ্যকে সাধক বলা যায়, এই নিমিত্ত যোগতপোরূপী ক্রিয়াই সাধকতার মূল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই ফলচতুষ্টয়ের আশা করিয়া অথবা এই সকলের মধ্যে কোন একটীর আশা করিয়া জীব ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ফলই ক্রিয়ার মূল। কিন্তু জীব এই ফলের ইচ্ছা কেন করে? যদি ইহা বিচার করা যায়, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীব সুখের ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এই চতুর্বর্গরূপী ফলের ইচ্ছা করিয়া থাকে। এই কারণে সুখই ফলের মূল। বৈষয়িক সুখদুঃখের পরপারে অবস্থিত যে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ, তাহা যথার্থ আনন্দ। পরমাত্মার যে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, সে আনন্দ ইন্দ্রিয়াদির সুখদুঃখের পরপারে অবস্থিত। জীব পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে সেই আনন্দ অন্বেষণ করিতে করিতে ভ্রমক্রমে সাংসারিক সুখকেই যথার্থ আনন্দ বিবেচনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আনন্দই সুখের মূল। “নেতি নেতি” বিচার দ্বারা জীব আপন জ্ঞানশক্তির সাহায্যে নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই মায়াকল্পিত বৈষয়িক সুখ প্রকৃত পক্ষে সুখ নহে; কারণ ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থের সুখ ক্ষণভঙ্গুরই হইয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকাল-স্থায়ী পরমাত্মার যে আনন্দ, উহাই যথার্থ আনন্দ; যখন জ্ঞানই এই বিচারের কারণ, তখন সেই জ্ঞানই আনন্দের কারণ। লক্ষ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর অবগতির নিমিত্তই জীবের অন্তঃকরণে জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত জ্ঞেয়-বস্তুই জ্ঞানের মূল। পরমতত্ত্বই জ্ঞেয়বস্তুর শেষ অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আর কোন পদার্থ জানিতে বাকী থাকে না। এই নিমিত্ত তত্ত্বানুভবই জ্ঞেয়পদার্থের মূল এবং তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্বই সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মই সকল তত্ত্বের মূল। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে, সমস্ত মতের মধ্যে, সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে,

সমস্ত সাধনার মধ্যে, একতা বা সামঞ্জস্য রক্ষা করাই সকলের মূল। এবং এই-প্রকার একতাযুক্ত সার্ব্বভৌম জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল এবং সেই পরব্রহ্ম ভাবাতীত হইয়াও নিখিল চরাচর বিশ্বের ভাবপ্রকাশক। এই প্রকারে জাতিধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মসদ্ভাব-পদের দৃঢ় পরম্পরা-সম্বন্ধ আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।

গুণ এবং কর্ম্ম দ্বারা জাতির বিচার হইয়া থাকে *। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণতরঙ্গের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ যে সকল প্রাণীতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের সেই গুণ-বিশেষত্বের দ্বারা বিশেষ বিশেষ জাতি নির্ণীত হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবগণের স্বাভাবিক কর্ম্মের গতি মিলাইয়া কর্ম্মবিচার দ্বারা জাতি নির্ণয় করা হয়। এই নিয়মানুসারে গুণ এবং কর্ম্মের পার্থক্য দেখিলে প্রত্যেক জীবশ্রেণীতে বিশেষত্ব-রূপ জাতির নিশ্চয় করা যাইতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে সাধারণ প্রাণীদিগের মধ্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ জাতির বিভাগ করা হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক বিচারানুসারে পুনরায় পৃথিবীস্থ জরায়ুজ জাতি চারি সংজ্ঞায় অভিহিত। যথা—আর্য্যজাতি, অনার্য্যজাতি, উন্নত পশুজাতি এবং নিকৃষ্ট পশুজাতি। এবং এই বৈজ্ঞানিক বিচারের সহায়তায় আর্য্যজাতি চারি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি। ইহার উপর গুণ এবং কর্ম্মের তারতম্যবিচার দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত অঙ্গেই জাতির বিচার বিজ্ঞানসিদ্ধ হওয়ায় জাতিবিভাগ স্বতঃসিদ্ধ +। গুণ এবং কর্ম্মসংক্রান্ত

---

* চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।—ইতি গীতায়াম্।

+ উদ্ভিজ্জাশ্চাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজাশ্চ জরায়ুজাঃ।
জীবাশ্চতুর্ব্বিধাং জাতিং লভন্তে স্বস্বভাবতঃ॥
যথা জরায়ুজা যান্তি জাতিভেদঞ্চতুর্ব্বিধম্।
আর্য্যানার্য্যনরাশ্চৈব পশবশ্চোত্তমাধমাঃ।
তথা নিসর্গসংসিদ্ধো হ্যার্য্যাণামার্য্যমানিনাম্।
চতুর্দ্ধা জাতিভেদোঽয়ং চাতুর্ব্বর্ণ্যং তদুচ্যতে॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ স্বতঃসিদ্ধাদন্যদ্বর্ণান্তরং যদা।
বিরুদ্ধং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং প্রকৃতের্নাত্র সংশয়ঃ॥—ইতি বৃহত্তন্ত্রসারে॥

রহস্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে গেলে, গুণ ও কর্ম্মের স্বরূপ কি এবং দুইয়ের আধার কি, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রকৃতিতে এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। প্রাকৃতিক ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ এই তিন প্রাকৃতিক গুণের অবশ্যই সম্বন্ধ আছে। ফলতঃ জাতিধর্ম্মের সহিত যে গুণত্রয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? উদাহরণস্থলে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ব্রাহ্মণ জাতিতে, সত্ত্ব এবং রজোগুণের মিশ্র সম্বন্ধ ক্ষত্রিয় জাতিতে, রজঃ এবং তমোগুণের যুক্ত সম্বন্ধ বৈশ্য জাতিতে, এবং তমোগুণের প্রাধান্য শূদ্র জাতিতে বিদ্যমান আছে। যদিও সকল স্থানেই ত্রিগুণের অবস্থিতি আছে, কিন্তু ঐ প্রাধান্যবিচার দ্বারা উপরি-লিখিত রীতি অনুসারে গুণের ব্যবস্থা চারি বর্ণে স্বীকৃত হইয়াছে। এই কারণে সনাতন ধর্ম্মের বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গুণের লক্ষণ প্রত্যেক বর্ণের অধিকারী মধ্যে আপনা-আপনি (স্বভাবতঃ) প্রকটিত হইয়া থাকে *। গুণবিজ্ঞানের ইহাই সিদ্ধান্ত বিচার। কিন্তু কর্ম্মবিজ্ঞানের তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার। জীব যে কিছু ক্রিয়া করে, তাহা কর্ম্ম নামে অভিহিত। জীবের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অভ্যাস দ্বারা তাহাতে বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম করিবার শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্ম করিবার শক্তি অভ্যাস দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে। ইহাই গুণ এবং কর্ম্মের সংক্ষেপ রহস্য। এই উভয়ের আধার বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্থির হইবে যে, অভ্যাসের সহিত কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এই নিমিত্ত যে মনুষ্য যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ কর্ম্মই করিতে সক্ষম হয়। কর্ম্মসংগ্রহ ব্যাপারে মনুষ্য স্বাধীন। কিন্তু গুণের সহিত শরীরের

---

* ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥-- ভগবদ্গীতা॥

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় গুণের বিচারে মনুষ্যকে অবশ্য পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ত্রিগুণের বিকাশভূমি এই স্থূলশরীর কেবল সেই সকল গুণের বিকাশ করিতে সমর্থ হয়,—যে সকল গুণের বীজরূপী সংস্কার কর্ম্মাশয় হইতে মনুষ্যের জন্মগ্রহণ করিবার সময় উহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং যেরূপ প্রকৃতি ঐ মনুষ্য নিজের মাতাপিতার রজোবীর্য্যের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অভ্যাস দ্বারা কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া একজাতীয় মনুষ্য ভিন্নজাতীয় মনুষ্যের কর্ম্ম অভ্যাস করিতে পারে। কিন্তু গুণের সহিত শরীরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় সাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা গুণের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। অবশ্য যোগ অথবা তপোরূপী অসাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা স্থূল শরীরের পরমাণুর পরিবর্ত্তন হইলে, পরে গুণসমূহেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। পুরাণাদি শাস্ত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং নন্দিদেবাদির জীবনে এইরূপ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উহা সাধারণ নিয়ম নহে। এতদ্ব্যতীত জন্মের সহিত স্থূল শরীর এবং স্থূল শরীরের সহিত গুণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে, এই নিমিত্ত গুণের বিচার করিয়া দেখিলে মনুষ্যকে অবশ্যই পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বিচার দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, যে মনুষ্য যে জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছে সে সেই জাতিতেই অবস্থান করিতে বাধ্য। নিম্নজাতীয় মনুষ্য কর্ম্মের পরিবর্ত্তন দ্বারা কখনই উচ্চজাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। একজাতীয় মনুষ্য যদি গুণ এবং কর্ম্ম উভয়ই আপনার জাতিধর্ম্মানুসারে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তবে সে সেই জাতিধর্ম্মের পূর্ণ অধিকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। গুণ ও কর্ম্ম উভয়ের মধ্যে একটীর অভাব হইলেও মানুষের অর্দ্ধ অধিকার থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্য্যশাস্ত্রের সকলপ্রকার বিচার আবার ত্রিভাবাত্মক। উহাদের নাম অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত। ঐ বিচার অনুসারে জাতিগত শুদ্ধিও ত্রিবিধ। জ্ঞানের দ্বারা জাতির অধ্যাত্ম শুদ্ধি, কর্ম্মের দ্বারা জাতির অধিদৈব শুদ্ধি, এবং গুণের দ্বারা জাতির অধিভূত শুদ্ধি বা অস্তিত্ব রক্ষা হইতে পারে। এই ত্রিবিধ শুদ্ধির মধ্যে কোনটীর অভাব হইলে, ঐ জাতিধর্ম্মের ঐটুকু অভাব থাকিবে। বলা বাহুল্য, কেবল কর্ম্মপরিবর্ত্তন দ্বারা জাতিধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না; ইহার প্রধান বৈজ্ঞানিক কারণ এই যে, জাতি সৃষ্টির একটী স্বাভাবিক অঙ্গ।

অতএব সাধারণতঃ সৃষ্টি এবং লয়ের স্বভাবসিদ্ধ ক্রমানুসারেই জাতিধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। অর্থাৎ একজাতীয় জীব কেবল জন্মান্তরের দ্বারাই অন্যজাতিত্ব লাভ করিতে পারে, সহসা পারে না। পরন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, এক জাতি ক্রমে বর্ণসঙ্কর এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মসঙ্কর হইতে হইতে ক্রমে পতিত হইতে অতি পতিত দশা প্রাপ্ত হইয়া, পরিশেষে সর্ব্বনিম্নে উপস্থিত হইতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি কোন জাতি আপনার কর্ম্ম সংশোধন করিলেও উচ্চ জাতিতে পরিণত হইতে সক্ষম না হয়, তবে আপন দশাকে আরও অধঃপতিত করিতে করিতে নীচজাতি কিরূপে হইতে পারে ?

বিজ্ঞানসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে এক প্রকারে সৃষ্টি অনাদি, এবং দ্বিতীয় প্রকারে সাদি স্বীকৃত হইয়া থাকে। বেদান্ত এবং সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভ দুই প্রকারে স্বীকৃত হইলেও সমষ্টি এবং ব্যষ্টিবিচার দ্বারা উভয় মতই সত্য এবং বিজ্ঞানসিদ্ধ। শাস্ত্রে ঐপ্রকার সৃষ্টিপ্রকরণও দুই প্রকারে কথিত আছে। অধ্যাত্ম বর্ণনায় পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় ভাবরূপী ইচ্ছাশক্তি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পঞ্চতত্ত্বের সত্ত্বাংশ হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি এবং তদনন্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হইতে হইতে এই পঞ্চীকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে *। পুনরায় জীবসৃষ্টির বিষয়ে প্রথম পরিণামে উদ্ভিদ্, তাহার পর স্বেদজ, তদনন্তর অণ্ডজ, তৎপশ্চাৎ জরায়ুজ ; এবং এই জরায়ুজসৃষ্টির উন্নতাবস্থায় মনুষ্যসৃষ্টি স্বীকৃত হইয়াছে। মনুষ্যদেহেই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলে ব্যষ্টিসৃষ্টিরও লয় হইয়া যায়। পরন্তু বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণাদিতে যে আধিভৌতিক সৃষ্টির বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় প্রথম কারণবারির সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ সেই কারণরূপী মহাসমুদ্রে সুবর্ণপ্রভাবিশিষ্ট অণ্ডের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। সেই অণ্ডের

---

* তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ
অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥
তৈত্তিঃ উঃ প্রং অং।

মধ্য হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তাঁহার রূপের বিষয়ে পুরাণে অতি অপূর্ব্ব বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ-মহাসমুদ্রে অনন্তরূপী শেষ-শয্যার উপর শ্রীবিষ্ণু ভগবান্ শয়িত ছিলেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে চতুর্ব্বেদ হস্তে ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার আবির্ভাব হয় *। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিবার সময় তাহাতে জীবসৃষ্টিবিস্তারের নিমিত্ত সনক সনন্দাদি চারিটী মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। পুত্র চারিটী পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয় নাই। পরমহংসাবস্থাই মনুষ্যের পূর্ণতা, পরমহংসাবস্থাতেই পূর্ণবিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মসদ্ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ চারিটী মহাপুরুষের দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহের বৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ ব্রহ্মার সমীপে নিবেদন করিলেন যে, আমাদের দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা হওয়া অসম্ভব। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা গত্যন্তর না দেখিয়া, পুনর্ব্বার আপনার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সপ্ত (মতান্তরে দশ) ঋষির উৎপত্তি করিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত হইল; কিন্তু তাঁহারাও এরূপ উন্নত ছিলেন যে, তাঁহা-দিগকে মৈথুনী সৃষ্টি করিতে হয় নাই, কেবল মনের দ্বারাই তাঁহারা অনেকানেক জীবময় অনন্ত সৃষ্টির বিস্তার করিয়াছিলেন †। সে সময় যে সকল মনুষ্যের সৃষ্টি

---

* তস্মিন্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥
ঋ০ ১০ অং ৮২ সূ ৬ মন্ত্র।

অধিভূত সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইপ্রকার শ্রুতির সহায়তায় পুরাণসমূহের নানা স্থানে সৃষ্টিপ্রকরণের বর্ণনা আছে। বিস্তারবাহুল্যের নিমিত্ত বিস্তারিত প্রমাণ দেওয়া গেল না।

† সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥
তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তে নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেব-পরায়ণাঃ॥
অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্ব্বসিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ॥
ভাগং। ৩ স্ক। ১২ অ।

হইয়াছিল, তাঁহারা উন্নতাধিকারী থাকায় সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; সে সময় এই সংসার জ্ঞান এবং শান্তিযুক্ত ছিল *। তদনন্তর বহুকাল পরে যখন সেই সকল ব্রাহ্মণপ্রজার কর্ম্মমধ্যে অধিকারগত ন্যূনাধিক্য হইতে লাগিল, সেই সময় তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকারভেদ উৎপন্ন হইল। সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি মনুকে ক্ষত্রিয়-রাজধর্ম্মের অধিকার প্রদান পূর্ব্বক প্রজাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ্য-মধ্যে যথাযোগ্যরূপে বিভাগ করিয়া রাজানুশাসন-মর্য্যাদার বিস্তার করিবার আদেশ প্রদান করেন। সেই সময় হইতে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা স্থাপিত হয় এবং প্রজা-সমূহের নিম্নগামী স্রোত রুদ্ধ হয়। মনুষ্যসৃষ্টির অধোগামী গতি,—যাহা স্বভাব-সিদ্ধ, উহা রোধ করিবার অভিপ্রায়েই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে।

এই জড়-চেতনাত্মক সৃষ্টিলীলা-মধ্যে দুইপ্রকার প্রবাহ পরিদৃষ্ট হয়। এক প্রবাহ অজ্ঞান-তমোময় জড়রাজ্য হইতে জ্ঞানপূর্ণ চৈতন্যরাজ্যের প্রতি প্রবাহিত হইতেছে, এবং দ্বিতীয় প্রবাহ জ্ঞানপূর্ণ চৈতন্যরাজ্যের দিক্ হইতে তমঃপূর্ণ জড়রাজ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। ঐ দুই প্রবাহানুসারে জীবসৃষ্টি-কেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম বিচার অনুসারে জীবগণকে জড়প্রবাহ এবং চৈতন্যপ্রবাহের অন্তর্গত স্বীকার করিয়া দুই অধিকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জ হইতে মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত জরায়ুজ জীব পর্য্যন্ত জড়প্রবাহের অন্তর্গত, এবং ভগবৎকৃপাধিকারী মনুষ্যগণই চেতন-প্রবাহান্তর্গত

---

* অসৃজৎ ব্রাহ্মণানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোভিনির্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্॥
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মহাভারত, শাং। ১৮৮ অঃ।

জীব। এই বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম প্রমাণ এই যে, মনুষ্য ব্যতীত সকল জীবই স্ব স্ব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন। অন্য প্রাণী আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনসম্বন্ধীয় ক্রিয়াসমূহ সকলই তাহার প্রকৃতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়া থাকে। সিংহকে তৃণভক্ষণে অভ্যস্ত করা অথবা তৃণভোজী পশুকে মাংসাশী রূপে পরিণত করা সর্ব্বথা অসম্ভব। এই নিয়মানুসারে মৈথুনাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেও বিবেচনা করা উচিত। কেবল তাহাই নহে, মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত প্রাণী স্ব স্ব প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যই করিতে কখন সমর্থ হয় না। কিন্তু মনুষ্য আপন প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক বহুপ্রকার অপ্রাকৃতিক কার্য্য সাধনে সক্ষম হয়, ইহাই মনুষ্যের বিশেষত্ব। পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন কেবল ভগবান্‌ই করিতে পারেন, কিন্তু জগদীশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ায় মনুষ্যগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ শক্তি অনুসারে যথাসম্ভবরূপে স্ব স্ব প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। মানবগণ এই অসাধারণ শক্তির দ্বারাই যে পাপ-পুণ্যভাগী হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ মনুষ্য যে সময়ে আপন শক্তিকে প্রকৃতি-প্রবাহের অনুকূল করিয়া ধর্ম্মোন্নতি করিয়া থাকে, সে সময় সে পুণ্যের অধিকারী হয়; এবং যে সময় সে অজ্ঞান-কবলিত হইয়া তামসিক কার্য্য দ্বারা অধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সময় সে পাপাধিকারী হইয়া যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, শ্রীভগবান্‌ মনুষ্যযোনিতে জীবকে স্বীয় স্বাধীন শক্তির অধিকার যেপ্রকার প্রদান করিয়াছেন, সেইপ্রকার অন্য-যোনিজাত জীব অপেক্ষা তাহাকে পাপপুণ্যের ভোগ বিষয়ে অতিরিক্ত পরা-ধীনতা প্রদান করিয়াছেন। এই কারণে অন্য প্রাণীরা স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফল-ভোগী হয় না, কিন্তু মনুষ্যকে আপন মানসিক এবং শারীরিক সকলপ্রকার কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। অতএব সকলের সহিত ক্রমোন্নতি সম্বন্ধ থাকিলেও জড়প্রবাহের জীবে প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ এবং মনুষ্যযোনিতে জ্ঞানের বিকাশ হওয়া বিচারসিদ্ধ। এই জ্ঞান-শক্তির সহায়তার ফলেই মনুষ্য-গণ আপন প্রকৃতি-শক্তির উপর আধিপত্য করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ে সমর্থ হয়, এবং অন্তে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তিপদের অধিকারী হইতে পারে। জড়-প্রবাহান্তর্গত জীব প্রকৃতি-মাতার আজ্ঞাধীন থাকে, এই নিমিত্ত প্রকৃতি-মাতা তাহাদিগকে স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপ-

স্থিত করিয়া দেন, এবং কোন অবস্থাতে তাহাদিগকে নিম্নাভিমুখে পতিত হইতে দেন না। কিন্তু মনুষ্যযোনিতে জীব ঐশী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন হইয়া যায়, তখন তাহাদের অবস্থাও কিছু অন্যরূপ হয়। মনুষ্যযোনিতে অহং-তত্ত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা এবং ক্রিয়ার জালে আবদ্ধ হইয়া মহামায়ার মোহে সে মনে করিতে আরম্ভ করে যে, আমিই সব করিতে পারি। এই কারণে সেই অবস্থায় তাহার অন্তঃকরণে আবরণশক্তির আধিপত্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশক্তির আধিক্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া যায়। এজন্য জড় ভাবের জীবগণ নিয়মিত ইন্দ্রিয় চালনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনে সমর্থ হয় না, এবং তাহাদের মধ্যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগ-ইচ্ছারও উৎপত্তি হইতে পারে না ; কিন্তু চেতন-প্রবাহের অধিকারী মনুষ্যযোনিতে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা প্রতি মুহূর্ত্তে বলবতী থাকে। এবং ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয়চালন-শক্তিও ক্রমশঃ অসাধারণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব মনুষ্যযোনিতে অন্তঃকরণের স্বাভাবিক প্রবাহ জড়ময় তমোভূমির প্রতি সর্ব্বদা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানবেত্তারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যগণ যদিও আপনাদিগের অসাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, তথাপি তাহাদিগের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গতি যে নিম্নগামিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। জড়-চেতনাত্মক সৃষ্টি-প্রবাহের গূঢ় রহস্য এই যে, আদি সৃষ্টিকালে পূর্ণ মানবের উৎপত্তি হইবার পরেও পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে মনুষ্যের গতি ক্রমে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, এবং এই কারণেই শ্রীভগবান্‌কে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়া সেই অধোগামী প্রবাহকে অবরোধ করিতে হইয়াছে। বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা দ্বারা ঐ স্রোত অবশ্যই অবরুদ্ধ হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা দ্বারা মানবের অধোগামী গতির অবরোধ হইয়াছে। কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা আর্য্যজাতি এতকাল এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা না থাকিলে এতদিন এ জাতি গ্রীক্ রোমান্ আদি জাতির মত নিজের অস্তিত্ব নাশ করিয়া ফেলিত।

পূর্ব্বকথিত জড় এবং চেতন প্রবাহান্তর্গত জীবসম্বন্ধী বিজ্ঞানের আলোচনা

দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে স্থিরীকৃত হইল যে, কোন জাতি আপন কর্ম্মসমূহকে উন্নত করিলেও একাএক উন্নত জাতি হইতে পারে না। কারণ প্রথমে পূর্ণ মানবের উৎপত্তি হইবার পর হইতে ক্রমাগত মনুষ্যজাতি পতিত হইয়াছে; এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গতি অধোমুখী হইয়া আছে। সুতরাং কোন জাতি যদি আপনার জাতিগত কর্ম্মকে সংশোধন করিবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর না থাকে, তবে তাহার নীচ জাতিতে পরিণত হওয়া সর্ব্বথা সম্ভব। আর্য্য এবং অনার্য্য জাতির সাধারণ লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে প্রায় এরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের কর্ত্তাকে আর্য্যজাতি এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধীকে অনার্য্যজাতি বলা যায়। বেদেও এই জাতি-বিভাগের বর্ণনা আছে *। আর্য্য শব্দের অর্থবিষয়ে বিচার করিতে করিতে চিন্তাশীল মনুষ্যগণ আর্য্য জাতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন যে, যে জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে করিতে ক্রমশঃ উর্দ্ধগতিশীল হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের নাম আর্য্যজাতি। আর্য্যজাতির ভাবার্থ যাহাই হউক, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেদ-বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদাই আর্য্যজাতির ধর্ম্মের মূলভিত্তি এবং ঐ ধর্ম্ম রক্ষাই প্রধানতঃ আর্য্যগণের জাতিগত জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশমাত্র। জীবগণের অন্তঃপ্রকৃতি যে যে ভাবের সহিত সম্মিলিত থাকে, সেই সেই ভাবের বহির্লক্ষণও সেইরূপ ভাবময় হইয়া থাকে, এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সামুদ্রিক শাস্ত্র দ্বারা পণ্ডিতেরা মনুষ্যের বহির্লক্ষণসমূহ দর্শন

---

* বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তাতে সধমাদেষু চাকন॥

ইতি ঋক্ শ্রুতিঃ।

এই স্থানে ভাষ্যকার আর্য্য শব্দের অর্থ সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বৈদিককর্ম্মাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রের সাধারণ তাৎপর্য্য হইতেও এরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। মনু-সংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণন আছে। এতদ্ব্যতীত আর্য্য অনার্য্য সম্বন্ধে সৃষ্টি উৎপত্তি বিষয়ে এরূপ কথিত হয় যে "জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্গুণৈঃ। জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়া-মনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥" ইহা হইতেও এই তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয় যে, বৈদিক ধর্ম্মের অধিকারীকে আর্য্য এবং বৈদিকধর্ম্ম রহিতকে অনার্য্য বলা যায়।

করিয়া তাহার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃপ্রকৃতির এরূপ মিশ্রসম্বন্ধ আছে যে, মনুষ্যগণের বহিশ্চেষ্টার সহিত তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ রহিয়া যায়। প্রত্যেক মনুষ্যের আহার, পান, উত্থান, উপবেশন, শ্রবণ, মনন, আচার, বিহার প্রভৃতি সমস্ত চেষ্টা দেখিলেই তাহার জাতিগত বিচার নির্ণীত হইতে পারে। এই নিমিত্ত তমোগুণপক্ষপাতী এসিয়া ও আফ্রিকার বিশেষ বিশেষ জাতিসমূহ, রজোগুণপক্ষপাতী বর্ত্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকার বিশেষ বিশেষ জাতিসমূহ, এবং সত্ত্বগুণপক্ষপাতিনী আর্য্যজাতির বাহ্য আচারসমূহমধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্থলে ইহা বিচার করা যাইতে পারে যে, এই ত্রিবিধ মনুষ্যজাতির ভাষা, পরিচ্ছদ, রীতি, নীতি, আহার, বিহার প্রভৃতি দ্বারা স্পষ্টরূপে তাহাদিগের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ যেপ্রকার আহার এবং বিহারাদির পক্ষপাতিনী, সেপ্রকার ইউরোপীয় জাতির মধ্যে দেখা যায় না। প্রত্যেক জাতির স্বীয় জাতিধর্ম্মের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে এবং তাহার ফলে আর্য্যজাতির সদাচারিগণ অন্য জাতির আচার দেখিয়া সে সকল বালক্রীড়াবৎ বিবেচনা করেন। এবং সেইরূপ অন্য ইউরোপবাসিগণ ভারত-বাসীদিগের রীতি নীতির উপর কটাক্ষ করিয়া হাস্য করিয়া থাকেন। বহির্ভাবের সহিত অন্তর্ভাবের এবং অন্তর্ভাবের সহিত বহির্ভাবের মিশ্র সম্বন্ধ আছে বলিয়া যেপ্রকার অন্তর্ভাবের প্রভাব বহিশ্চেষ্টাসমূহে নিপতিত হয়, সেইপ্রকার বহিঃক্রিয়াসমূহের প্রভাবও অন্তর্ভাবের উপর পড়িয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক মনুষ্যজাতির প্রধান প্রধান নেতৃগণকে আপনাদিগের জাতীয় আচারসমূহ রক্ষা করিতে তৎপর দেখা যায়। পৃথিবীর মনুষ্যজাতিসমূহমধ্যে যে জাতির আচার যেরূপ থাকুক না কেন, এবং এক জাতির আচার অন্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট হউক না কেন, অথবা যাহার যে কোন বিষয়ে কিছু যোগ্যতা থাকুক না কেন, কিন্তু সেই জাতি, আপন জাতীয় ভাবের রক্ষা ততক্ষণ পর্য্যন্ত করিতে পারে, আপনার জাতিগত জীবন ততক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার জাতি-গত রীতি, নীতি, আহার, পান, ভূষণ, আচ্ছাদন, ভাষা এবং সদাচার রক্ষায় দৃঢ় এবং তৎপর থাকে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবল আর্য্যজাতি

তেজস্বিতার সহিত বলিতে পারেন যে, আমরাই আপনাদিগের ক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষায় সক্ষম। আমাদিগের জননীগণ কখনও দ্বিচারিণী হইয়া আপন শরীর কলঙ্কিত করেন নাই, আর্য্যনারী ধর্ম্মানুসারে এক জীবনে কখনও দুই স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আর্য্যজাতিই গৌরবের সহিত বলিতে পারেন যে, বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মের পবিত্র মর্য্যাদা কেবল তাঁহাদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। ইহলোকে কেবল আর্য্যজাতিই লোকশিক্ষার্থ বলিতে সমর্থ যে, তাঁহাদেরই জাতিধর্ম্মে এরূপ দৃঢ় নিয়ম আছে যে, মনুষ্যের প্রত্যেক শারীরিক চেষ্টারূপী সদাচারের সহিত ধর্ম্মের অসাধারণ সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়া থাকে। এই মর্ত্ত্যলোকে একমাত্র আর্য্যজাতিই ধর্ম্মের অসাধারণ শক্তি প্রচার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ যে, কর্ম্ম-কাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড এই তিন কাণ্ডের ক্ষমতা এবং এই তিন কাণ্ডের সমান অধিকার তাঁহাদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত এই ক্ষণভঙ্গুর-সৃষ্টিমধ্যে কেবল আর্য্যজাতিই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মনুষ্যদিগকে বিষয়বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক এ কথা বলিতে পারেন যে, মনুষ্যের সর্ব্বদা অন্তর্লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সকল উন্নত মানবই বলিতে সক্ষম যে, তাঁহারা আপনাদিগের প্রত্যেক শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টা করিতে করিতেও এই সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতাকে বিস্মৃত হন না, এবং সর্ব্বদা সকল অবস্থাতে আপনাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিই লক্ষ্য রাখেন।

একজাতি যখন আপনাদিগের সদাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর জাতির রীতি, নীতি, আহার, পান, ভাষা এবং আচার গ্রহণ করিতে থাকে, তখন বহির্লক্ষণ বিচার করিলে, দেখা যায় যে, সেই জাতির জাতিগত পার্থক্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই কালান্তরে সেই জাতির অন্তঃ-প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া, তাহার পূর্ব্বজাতিভাব পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং শেষে সেই জাতি একটী নূতন জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই প্রকারের অনুকরণ দ্বারা ঐ জাতির জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক জাতি যদি কখনও অপর জাতি দ্বারা বিজিত হইয়া যায়, অর্থাৎ অপর-দেশবাসীরা যদি অন্য কোন দেশে গমন করিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক

আপনাদিগের অধীন করিয়া লয়, তবে প্রায়ই দেখা যায় যে, পরাজিত জাতি ক্রমশঃ বিজয়ী জাতির রীতি, নীতি, ভাষা, আচার এবং বেশ প্রভৃতির অনুকরণ করিতে থাকে। সংসারে দুইটী শক্তি দেখা যায়—একটী লঘু এবং অপরটী গুরু। গুরুশক্তি দ্বারা লঘুশক্তি অধিকৃত হইয়া যায়। এই কারণে গুরু সাত্ত্বিকশক্তি দ্বারা শিষ্যকে অধীন করিয়া লয়েন, ধর্ম্মাচার্য্যগণ আপনাদিগের মতাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈশ্বরাবতার বলিয়া উক্ত হন ; এবং এই কারণে জেতৃগণ প্রথমে আপনাদিগের রাজসিক শক্তির দ্বারা বিজিত জাতিকে বলপূর্ব্বক আপনাদিগের অধীন করিয়া লয়েন এবং ক্রমশঃ বিজিত জাতির আহার বিহারাদি সদাচারের উপরেও আপনাদিগের পূর্ণাধিকার স্বতঃই স্থাপন করিতে পারেন। এই অভ্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই জেতৃগণের গুরুশক্তির দ্বারা পরাজিত জাতির লঘুশক্তি স্বতঃই অবনতমস্তক হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতে হইতে গুরু-শক্তির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে জগদ্বিজয়িনী প্রাচীন ইউনান্ জাতি রোমান্ শক্তি-মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়া একটী নূতন ক্ষুদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে পুনরায় রোমান্ জাতির সম্পূর্ণ রূপে লোপ হইবার পরে সেই স্থানে এক নূতন ইটালিয়ান্ জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর সমস্ত দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা সপ্রমাণ হয় যে, যে যে স্থানে কোন সময়ে বিজয়ী জাতির গুরুশক্তি কোন পরাজিত জাতির লঘুশক্তিকে আপনার অধীন করিয়া লইয়াছে, সেই সেই স্থানে শেষে সেই বিজিত জাতির লোপও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর্য্যগণ আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে নানা জাতির দ্বারা বিজিত হইলেও এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হয় নাই ; ইহা আর্য্যজাতির একটী অপূর্ব্ব মহত্ত্ব।

সৃষ্টির সকল বিভাগের রক্ষা এবং ক্রমোন্নতির নিমিত্ত জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি এই দুই শক্তির আবশ্যকতা হইয়া থাকে। জাতিগত জীবনের রক্ষা এবং উন্নতির নিমিত্ত এই দুইটী শক্তির আবশ্যকতা আছে। এই দুই শক্তির বিচার দ্বারা ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষাত্র তেজের বিভাগ স্বীকার করা যায়। এই দুই শক্তিকে সাত্ত্বিক শক্তিও বলা যাইতে পারে। মনুষ্য জাতির উন্নতাবস্থা এবং অবনতাবস্থার দ্বারা এই শক্তিদ্বয়ের তারতম্য হইয়া থাকে।

প্রাচীন আর্য্যজাতিমধ্যে সাত্ত্বিক শক্তির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু নবীন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে রাজসিক শক্তির প্রাধান্য আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কোন জাতির শক্তি লঘু হইয়া পড়িলেই, অন্য জাতি কর্ত্তৃক তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যজাতির রাজসিক শক্তি লঘু হইয়া পড়ায় আজ সহস্রাধিক বর্ষমধ্যে যদিও এই জাতি রাজসিক হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সাত্ত্বিক শক্তির আধিক্যসম্পন্ন জাতি ইহাকে পরাস্ত করিয়া লইতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত যে সকল বৈদেশিক জাতি এই দেশ জয় করিয়াছে, সে সকল জাতির আধ্যাত্মিক বিচাররূপ সাত্ত্বিকশক্তি আর্য্যজাতি অপেক্ষা লঘু। এই কারণে রাজসিক অবনতির পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও সাত্ত্বিকশক্তির প্রবলতা অবস্থিতি নিমিত্ত এই আর্য্যজাতি মৃতকল্পা হইয়াও অদ্যাপি জীবিত আছে। রাজসিক শক্তির নাশ প্রথমেই হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, অন্য জাতিরা এথানে আসিয়া এই জাতিকে আপনাদিগের বশীভূত করিতে পারিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি স্বীয় রাজসিক শক্তি বিনাশের জন্য বিশেষ চিন্তিত নহেন। যদিও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আজ পর্য্যন্ত এরূপ আশঙ্কা করেন নাই যে, আর্য্যজাতির মধ্য হইতে সাত্ত্বিক শক্তিও একেবারে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি দূরদর্শী পুরুষেরা এক্ষণে ঐ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া চিন্তিত হইয়াছেন। সদাচার পালন বিষয়ে আর্য্যজাতির প্রবৃত্তি প্রত্যহ তীব্রবেগে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। হিন্দুধর্ম্মসমাজ হইতে বিষয়বৈরাগ্যপ্রবাহ হ্রাস হওয়ায় প্রতিদিন বিষয়তৃষ্ণা প্রবলবেগ ধারণ করিতেছে। এখনও আর্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকিলেও কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনের উপর কাহারও শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছে যে, যথার্থ বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের আদর্শ-জীবন, কদাচিৎ বহু অনুসন্ধান করিলে, পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের মধ্য হইতে পতিসেবারূপী ধর্ম্মের ন্যূনতা হওয়ায় বিলাসবুদ্ধির বৃদ্ধিই চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা বিকৃতমস্তিষ্ক পুরুষগণ নারী-জাতির পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অনার্য্যসেবিত বিধবা-বিবাহ এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রচারে অনেক স্থানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আর্য্যনারীগণের মধ্যে পতিভক্তির অভাব, আর্য্যপুরুষদিগের মধ্যে সত্যপ্রিয়তার অভাব, এবং আর্য্য বালক বালিকাদিগের মধ্যে পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তির

অভাব দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যে অন্তঃশুদ্ধি সনাতন ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহার লোপ হওয়ায় বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি এই জাতির অধিক লক্ষ্য পড়িয়াছে। পরোপকারপ্রবৃত্তি, স্বজাতি-অনুরাগ, স্বদেশপ্রেম, উৎসাহ, ন্যায়দৃষ্টি, সরলতা, পবিত্রতা, ঐক্য, আস্তিকতা, শৌর্য্য, পুরুষার্থশক্তি আদি মনুষ্যজাতির উন্নত গুণাবলীর অভাব এই জাতির মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। গুণ পরীক্ষার শক্তি সমাজের মধ্য হইতে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। সমাজের মধ্যে এরূপ লঘুতা প্রবেশ করিয়াছে যে, যদি কোন মহাপুরুষ দেশের নিমিত্ত, জাতির নিমিত্ত, এবং আপনার প্রিয় সনাতন ধর্ম্মের নিমিত্ত কদাচিৎ আত্মোৎসর্গ করেন, তবে তাঁহাকে লোকে স্বার্থপর, প্রবঞ্চক এবং কপটী বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত দুর্ব্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়; এবং সমাজে বাহ্যাড়ম্বরসম্পন্ন স্বার্থপর লোক ধর্ম্মসেবী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দৈবকোপ এবং মন্দভাগ্যের লক্ষণ রূপে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ এই আর্য্যজাতিকে গ্রাস করিতেছে। ইহার শান্তির নিমিত্ত কোন লৌকিক উপায়ের উদ্ভাবন হইতেছে না। অতএব আর্য্যজাতিভাবের নানা পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মীদিগের শনৈঃ শনৈঃ অধোগতি হইতেছে এইরূপ অনুভব করিয়া বিদ্বজ্জন উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং বিচার করিতেছেন যে, এই নিম্নগামী স্রোতের অবরোধ করিবার নিমিত্ত প্রবল যত্ন হওয়া উচিত।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্যাধি-নির্ণয়।

শরীরের মধ্যে যেরূপ মস্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা সেইরূপ ভারতবর্ষ এই পৃথিবীমধ্যে শীর্ষস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের বিকাশ বশতঃ সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের

ক্রমোন্নতির লক্ষণ দেখিয়া মনুষ্যের ক্রমোন্নতি বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞানের পূর্ণতাই মনুষ্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং পূর্ণজ্ঞানী মনুষ্যদিগের মধ্যেই ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষই ধর্ম্মের আদি বিকাশভূমি। পূর্ণ-প্রকৃতি-যুক্ত পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এবং পূর্ণ-শক্তি-যুক্ত অবতারগণের আবির্ভাব ভারতবর্ষেই হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির সহায়তা হইতেই অন্য দেশ-সমূহের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পুষ্টি হইয়াছে, এবং অনাদিসিদ্ধ, অভ্রান্ত ও পূর্ণবিজ্ঞান-যুক্ত সনাতন ধর্ম্মের আবির্ভাব ভারতবর্ষমধ্যেই হইয়াছে। এই কারণে বিচার-বান্ মাত্রেই স্বীকার করেন যে, আধ্যাত্মিক বিচারানুসারে ভারতবর্ষই পৃথিবীর উত্তমাঙ্গ।

প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ-ভূমি ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের মুকুট-মণির ন্যায়। ইহার তিন দিকে অপার অনন্ত জলরাশি এবং অপর এক দিকে অনন্ত সৌন্দর্য্যময় গগনভেদী অটল হিমাচল বিস্তৃত হইয়া আছে। সুতরাং এই পবিত্র ভূমিকে চারিদিক্ হইতেই প্রকৃতিদেবী স্বীয় অতুলনীয়া শক্তির দ্বারা রক্ষা করিতে-ছেন। জলের দিক্ তো স্বভাবতই অতি দুর্গম, এবং স্থলের দিকে দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি ও সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট অত্যন্ত কষ্টের সহিত অতিক্রম না করিলে কেহই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের বাহির হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করা বহু পরি-শ্রম এবং অতি ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতি-মাতার এরূপ পরিমাণে অনু-গ্রহ সত্ত্বেও তিনি ভারতবর্ষকে বিজাতীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে সময় হইতে ভারতবর্ষে রাজসিক-শক্তির লোপ আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে নিয়মিতরূপে এই চিরস্বাধীন আর্য্যজাতি নানা বিজাতীয় জাতি দ্বারা বিজিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষীয় ভূমির অতুলনীয়া উর্ব্বরা শক্তি, ভারত-বর্ষীয় পর্ব্বতসমূহের অমূল্য-রত্ন-প্রসবিনী শক্তি, ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র-গর্ভের অপূর্ব্ব মুক্তা প্রবালাদি উৎপাদিকা শক্তি, ভারতবর্ষীয় অরণ্যানীসমূহের নানা বিচিত্র জীবজন্তু এবং নানা বিচিত্র বৃক্ষলতা গুল্মাদি প্রসব করিবার স্বাভা-বিক শক্তি, ইহসংসারে অতুলনীয়। এই কারণে এতকাল অবধি বিজাতীয় রাজ-গণের দ্বারা মর্দ্দিত এবং লুণ্ঠিত হইয়াও এ পর্য্যন্ত ভারতভূমি হতশ্রী হইয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কারণেই নানা ভিন্নজাতীয় ব্যক্তি

সময়ে সময়ে এই ভূমির উপর পূর্ণ অধিকার স্থাপনার্থ যত্ন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি যত্নের দ্বারা সফলকামও হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত গত দুই সহস্র বৎসর মধ্যে ক্রমে নয়টী বিজাতীয় রাজা স্থলপথের দ্বারা ভারতে অধিকার স্থাপন করিবার নিমিত্ত এই ভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রজা এবং দ্রব্যনাশের সম্বন্ধে সকলেই একপ্রকার পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন; কিন্তু কেবল দুইটী নরপতিই স্থায়িরূপে অধিকার স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই পুরুষার্থ দ্বারা ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় পাঠান এবং শেষ ভাগে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। বিজাতীয় এবং বিধর্ম্মী রাজগণের দ্বারা এই আর্য্যজাতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও আপনার সাত্ত্বিক শক্তির প্রভাবে সে সময় সম্পূর্ণরূপে হীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। আর্য্যধর্ম্ম-বিরোধী এবং পরজাতিপীড়ন-পক্ষপাতী মুসলমান শাসকদিগের হস্তে অসহনীয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও আর্য্যগণের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত স্বজাতীয় ভাবের বিলোপ সাধন না হওয়ায়, সে সময় চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী অত্যাচাররূপী প্রজ্বলিত অগ্নিশিখামধ্যেও তাঁহারা আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়,—প্রকৃতিতে এই তিনটী স্বাভাবিক গুণ বর্ত্তমান আছে। এই অভ্রান্ত নিয়মানুসারে উন্নতির সহিত অবনতিও অবশ্যম্ভাবী। এই অকাট্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সময় মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজসিক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শাসক-সম্প্রদায়ের পাপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, সেই সময় মুসলমান-পীড়িত আর্য্যগণ পুনরায় আপনাদিগের রাজসিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়া মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। সেই পরিবর্ত্তনের ফলে শিখ, গুরখা, মহারাষ্ট্র, রাজপুত প্রভৃতি জাতির মধ্যে পুনরায় বীরত্বের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পতিত আর্য্যগণের মধ্যে রাজসিক শক্তির পূর্ণবিকাশ হইবার পূর্ব্বেই সেই সময়ে ভারতবর্ষে রাজসিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নত ইউরোপীয় জাতির প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গুণের স্বভাব এই যে, তমোগুণ রজোগুণ দ্বারা এবং রজোগুণ সত্বগুণ দ্বারা স্বতঃই দমিত হইয়া থাকে।

সেই সময়ে পুনরুত্থিত আর্য্যজাতির মধ্যে রাজসিক-শক্তির বিকাশ হইতে পারিল না। পরন্তু রাজসিক শক্তিতে বিশেষ উন্নত ইউরোপীয় জাতিকে আপনাদিগের জন্মভূমিতে দর্শন করিয়া স্বতঃই তাঁহারা (আর্য্যজাতি) আপনাদিগের সাম্রাজ্য তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে গুণের শ্রেষ্ঠতানুসারে ইংরাজ জাতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। এই নিমিত্ত সদ্গুণের পুরস্কারস্বরূপ এই রত্নশ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষ স্বতঃই তাঁহাদিগের লাভ হইল। এই আধিদৈবিক কারণেই ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনার্থ ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অধিকতর শারীরিক বলপ্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। যে প্রকার ঘোরতর পাশব-বলপ্রয়োগ দ্বারা মুসলমানগণ পূর্ব্বকালে আপনাদিগের সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কর্ম্মের অপূর্ব্বগতি অনুসারেই গুণবান্ ইংরাজজাতির সে প্রকার পাশব-বল প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় নাই। মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইলে পর অধঃপতিত আর্য্যজাতির ক্ষীণ রাজসিক-পুরুষার্থ-বিকাশ-কালে, স্বতঃই বুদ্ধিকৌশলপ্রয়োগ এবং আর্য্যজাতিরই সাহায্যে ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রাবল্য স্থাপিত হইল, এবং ক্রমশঃ তাঁহারা ভারতবর্ষে পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তকাল হইতে * স্বাধীনতা-সুখাস্বাদনকারী আর্য্যজাতি অল্পদিন হইতেই হীনবল হইয়াছেন। আর্য্যজাতির পরাধীন অবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা,—প্রথম মুসলমান সাম্রাজ্যের সময়, এবং দ্বিতীয়

* প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে বিদিত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতি এপ্রকার বহুদিনের নিমিত্ত হীনবল কখনও হয় নাই। যে প্রকার অতি পূর্ব্বকাল হইতে আপনাদিগের প্রাচীনত্ব জ্ঞান আর্য্যজাতির আছে, ঐ প্রকার জ্ঞান পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কালপরিমাণ যথা,—

"লোকানামন্তকৃৎ কালঃ কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ।
স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে॥
প্রাণাদিঃ কথিতো মূর্ত্তস্ত্রুট্যাদ্যোঽমূর্ত্তসংজ্ঞকঃ।
ষড়্ভিঃ প্রাণৈর্বিনাড়ী স্যাত্তৎষষ্ট্যা নাড়িকা স্মৃতা॥
নাড়ীষষ্ট্যা তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
তত্ত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈস্তথা॥

ইংরাজ সাম্রাজ্যের সময়। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে আর্য্যজাতি অত্যন্ত অধঃপতিত হইয়া পড়িলেও তাহারা আপনাদিগের জাতীয় ভাব বিস্মৃত হয় নাই। সেই সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, সেই ঘোরতর আপৎকালেও এই আর্য্যজাতি আপনাদিগের রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য, বেশ, ভাষা এবং সদাচারাদি অর্থাৎ নিজ আর্য্যভাব বিস্মৃত হয় নাই। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণু স্বামী, শ্রীচৈতন্যাচার্য্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীরামানন্দ স্বামী, শ্রীরামদাস স্বামী, শ্রীমধু-

---

ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ সঙ্ক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহ উচ্যতে॥
সুরাসুরাণামন্যোঽন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ।
তৎষষ্টিঃ ষড়্‌গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ॥
তদ্‌দ্বাদশসহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্।
কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদব্যবস্থয়া॥
যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ॥
সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ॥
ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী॥
কল্পাদস্মাচ্চ মনবঃ ষড়্‌ব্যতীতাঃ সসন্ধয়ঃ।
বৈবস্বতস্য চ মনোর্যুগানাং ত্রিঘনো গতঃ॥
অষ্টাবিংশাদ্‌যুগাদস্মাদ্‌ যাতমেতৎ কৃতং যুগম্।
অতঃ কালং প্রসংখ্যায় সংখ্যামেকত্র পিণ্ডয়েৎ॥

ইত্যাদি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ শাস্ত্রানুসারেণ কল্যব্দ ৪৩২০০০, দ্বাপরাব্দ ৮৬৪০০০, ত্রেতাব্দ ১২৯৬০০০, কৃতাব্দ ১৭২৮০০০ যুক্তং সসন্ধিমনুমানং ৪৩২০০০০ ইদং চতুর্দ্দশগুণং কল্পপ্রমাণং কৃতোনং যুগসহস্রমিত্যত্ত আছে।

সূদনাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্য-কালে আগরার তাজ্ এবং শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির প্রভৃতি স্থাপত্যশিল্প এবং কাশ্মীরী শাল, ঢাকাই মলমল, কটকের অলঙ্কার এবং দিল্লীর নানাপ্রকার শিল্পসম্ভারের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। মুসলমান সাম্রাজ্যসময়ে শ্রীজয়দেব, শ্রীগোস্বামী তুলসীদাস, শ্রীসুরদাস, শ্রীকেশব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবিদ্যা-পতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীক্ষেমানন্দ এবং নৃপতিগণের মধ্যে শ্রীমহারাণা কুম্ভ, শ্রীমহারাজ প্রতাপ সিংহ, শ্রীমহারাজ সাবন্ত সিংহ অর্থাৎ নাগরীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে গোপাল নায়ক, বৈজু নায়ক, হরিদাস গোস্বামী এবং তানসেন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব আর্য্যসঙ্গীত-বিদ্যার মহিমা পালন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের দ্বারা কেবল আর্য্যজাতিরই লাভ হয় নাই, পরন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রের মহাদ্বেষী মুসলমানগণও সেই মাধুরী বিদ্যার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্যসময়ে ভারতীয় বাণিজ্যেরও এরূপ বিস্তার ছিল যে, তাহার লোভেই ইউরোপের সমস্ত উৎসাহী জাতিসমূহ ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন। এই বাণিজ্যোন্নতির জন্যই ইউরোপনিবাসী ভাস্কোডিগামা অতুলনীয় যোগ্যতা দেখাইয়া ভারতবর্ষের সরল পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং এই বাণিজ্যো-ন্নতির কারণেই ইংরাজজাতি আজ ভারতবর্ষে পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমান সাম্রাজ্যসময়ে ভারতবাসী অত্যন্ত হীনবীর্য্য হইলেও তাঁহারা আপনাদিগের বেশ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হন নাই। সাধারণ শরীরাচ্ছাদন এবং উষ্ণীষাদি ধারণের যথাবৎ রীতি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ছিল। পরিচ্ছদের দৃঢ়তা রক্ষা বিষয়ে সে সময় ভারতবর্ষের প্রভাব এরূপ প্রবল ছিল যে, জেতা হইলেও মুসলমানগণ ক্রমশঃ আপনাদিগের বেশপরি-বর্ত্তন পূর্ব্বক আর্য্যবেশের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে যদিও আর্য্যদিগের ভাষামধ্যে বিস্তর প্রভেদ পড়িয়া গিয়াছিল এবং রাজকার্য্য চালাই-বার নিমিত্ত নূতন উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আরবী অথবা পারসী ভাষার বিস্তার অধিক পরিমাণে হইতে পারে নাই, অথবা আর্য্যগণ আপনা-দিগের ভাষায় দ্বেষপরায়ণ হইয়া পড়েন নাই। এতদ্ব্যতীত সেই সময়ে

মনুষ্যদিগের দৃঢ়চিত্ততা বশতই ভারতবর্ষে আরবী এবং পারসীর পূর্ণ বিস্তার না হইয়া বরং জেতৃগণের ভাষামধ্যেই পরিবর্ত্তন-সাধিত নূতন উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্বন্ধেও সে সময় অনন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘোর অত্যাচার বর্ণন না করিয়া এই মাত্রই বলিতে পারা যায় যে, মহম্মদীয় জাতি একহস্তে কোরাণ এবং অপর হস্তে উলঙ্গ তরবার লইয়া ভারত-শাসন-কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহাদিগের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ ব্যয়িত হইলেও আর্য্যদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনরূপ প্রভেদ দেখা যায় নাই। আর্য্যসদাচারসমূহের দৃঢ়তা বিষয়ে ইহার অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি থাকিতে পারে যে, যে সকল ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ লোভ অথবা ভয়ের বশীভূত হওয়ায় আচারহীনতা প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা মুসলমান সম্রাট্‌দিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ণ বলবান্ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আর্য্য-গণের নিকট আপনাপন সমাজের মধ্যে আপনাপন সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। অপরদিকে মুসলমান সম্রাট্‌গণ দ্বারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও যথেষ্ট পরিমাণে ক্লিষ্ট হইয়াও সদাচারী মেওয়ার রাজবংশীয়গণ আর্য্যদিগের নিকট "হিন্দুসূর্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য স্থাপনপূর্ব্বক প্রশ্ন করা যায় যে, পৃথিবীমধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ঘোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্বজাতি-গৌরব ত্যাগ করেন নাই, তবে এই উত্তর মিলিবে যে, পৃথিবীমধ্যে মেওয়ারের রাজপুতগণই সেই গৌরবান্বিত পদের অধিকারী। যে সময় রোমান্-গণ বৃটন্ জাতির উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন বৃটন্ জাতি ক্রমশঃ রোমান্ জাতির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রকারের পরিবর্ত্তন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে প্রাপ্ত হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বীরপ্রসবিনী মেওয়ারের ক্ষত্রিয় জাতি ক্রূরতাপূর্ণ যবন-সাম্রাজ্যের মধ্যে আপনার পূর্ণ দৃঢ়তার পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইয়াছে।

মোগল-সাম্রাজ্যের লুপ্তপ্রায় অবস্থায় এবং মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য-সময়ে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইংরাজরাজকে সৈন্য-বলের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারত-বিজয় কার্য্য সাধন করিতে হয় নাই, তাঁহা-দিগের গুণের প্রভাবে আলস্য এবং প্রমাদের পক্ষপাতী ভারতবাসিগণ কর্ম্মঠ এবং বুদ্ধিমান্ ইংরাজজাতিকে আপনাদিগের হিতকারী রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়া-

ছিলেন। বহুকাল হইতে দাসভাবাপন্ন, হীনবীর্য্য ভারতবাসিগণ সে সময় রাজ্য-শাসন-ক্ষমতা আপনাদিগের মধ্যে দেখিতে পান নাই, এবং অপরদিকে মুসলমান সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া দীনহীন ভারত-বাসিগণ বুদ্ধিমান্, দেশকালপাত্রজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং রজোগুণাবলম্বী ইংরাজজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পলাসী যুদ্ধের বিবরণ স্মরণপূর্ব্বক এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন। খৃষ্টের জন্ম-গ্রহণ করিবার ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে পরাক্রান্ত জুলিয়াস্ সিজর্ কয়েক সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া ব্রিটন্ দ্বীপ অধিকার করিবার নিমিত্ত যে সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাহাদের সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, বৃটন্-দ্বীপবাসীদিগের অবস্থা অর্দ্ধপশুর ন্যায়। অপক্ক মাংস তাহাদিগের আহার্য্য, ভূগর্ত্ত অথবা সাধারণ পর্ণকুটীর তাহাদিগের আবাসগৃহ, তরুশাখা তাহাদিগের বিহার-পদার্থ, তাহাদিগের শরীর বিবিধ বর্ণের রঙ্গের দ্বারা চিত্রবিচিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের ভাষা বিকট পশু-শব্দাবলির ন্যায় শ্রুতি-কঠোর। কিন্তু যে সময় বীরচূড়ামণি সেকেন্দর সাহ রোমান্ বীর জুলিয়াস্ সিজারের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশে ভারত-বিজয়-সাধনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি এবং তাঁহার সহচরবর্গ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, স্বদেশে অবস্থিতি-কালে যে আর্য্যজাতিকে তাঁহারা হীনবীর্য্য এবং অসভ্য বিবেচনা করিতেন, সেই আর্য্যজাতি তাঁহাদিগের গ্রীক্‌জাতির শিক্ষাগুরু। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, আর্য্যজাতির অতুলনীয় বীরত্ব, আর্য্যজাতির বেশ-ভূষা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতা, আর্য্যজাতির দয়া, শীলতা, নির্ভয়তা, আতিথ্যবৃত্তি এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলী সন্দর্শনে মন বিমোহিত হয় এবং আর্য্যজাতির ভাষা মন্দাকিনী-মৃদুতরঙ্গ-নাদের মধুরতা এবং স্বর্গীয়তার ন্যায় শ্রুতিমধুর। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইতে পারেন যে, আর্য্যজাতিই পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির আদি এবং শিক্ষাগুরু। ধর্ম্মোন্নতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, শিল্পোন্নতি, সংগীত-বিদ্যার উন্নতি, যুদ্ধবিদ্যার উন্নতি, চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি, জ্যোতিষ বিদ্যার উন্নতি, দার্শনিক উন্নতি, সাহিত্যোন্নতি, সমাজগত উন্নতি এবং ভাষাগত উন্নতি প্রভৃতির বিষয়ে ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদনন্তর

ভারতেরই জ্ঞানপ্রভা শিষ্যপরম্পরা দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা ইহা দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের জ্ঞানজ্যোতিঃ ক্রমে বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়া যুনান (গ্রীস্) দেশে উপস্থিত হয়। পরে সেই জ্যোতিঃ রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করায় তাহা ইউরোপ মধ্যে পূর্ণরূপে আলোক প্রদানে সমর্থ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কালে এই স্থানের জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা প্রাচীন আরব এবং প্রাচীন চীনবাসিগণ যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু করাল কালের বিকরাল গতির বিরাম নাই! প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি পশুবৎ ছিল, আজ সেই জাতি যোগ্যতা লাভপূর্ব্বক অধঃপতিত আর্য্যজাতির শিক্ষাগুরু হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে যে জাতি জগদ্‌গুরু নামে প্রসিদ্ধ ছিল, সেই আর্য্যজাতির বর্ত্তমান হীনাবস্থা দেখিয়া আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহ উপহাসপূর্ব্বক অঙ্গুলি উত্থিত করিতেছে!!

অনুকরণশূন্যতা এবং একতা না হইলে, জাতীয় ভাবের উন্নতি হইতে পারে না, এবং জাতীয়ভাব রক্ষা ব্যতীত কোন জাতি চিরকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না। স্বজাতীয় একতার অভাব এবং পরজাতীয় অনুকরণ-বৃদ্ধি দ্বারা আজ আর্য্যজাতি এরূপ হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহার দুর্গতি দেখিয়া স্বদেশ-হিতৈষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই এক্ষণে শঙ্কিত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে আর্য্য-জাতির সাত্ত্বিক শক্তির কিয়দংশ প্রবল থাকায় তাঁহারা আপনার জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ে এই জাতির ভিতর হইতে যদিও রাজসিক শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু স্বধর্ম্মরূপী সাত্ত্বিকী শক্তির পূর্ণরূপে হ্রাস না হওয়ায় ইহা-দিগের মধ্যে স্বজাতীয় ভাবের ন্যূনতা হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রতিদিন এই জাতির মধ্য হইতে স্বজাতীয় ভাব বিলুপ্তপ্রায় হইতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এরূপ সন্দেহ করেন যে, অধুনা আর্য্যজাতির মধ্য হইতে সাত্ত্বিক তেজের নাশও আরম্ভ হইয়াছে। এই সন্দেহ অমূলক নহে। কারণ বর্ত্তমান শান্তিযুক্ত সাম্রাজ্য-মধ্যে এপর্য্যন্ত জাতীয় ভাবের কোনও প্রকার উন্নতি পরিদৃষ্ট হইল না। ইহার মধ্যে এরূপ কোন ধর্ম্মোদ্ধারক আবির্ভাব হয়েন নাই, যাঁহাকে আমরা ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যদিও দুই এক ব্যক্তির দ্বারা কোন কোন নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে একতার অভাব, সদাচারসমূহের

অভাব, শক্তির অভাব, এবং ঈশ্বরভক্তির অভাব প্রভৃতি ন্যূনতার নিমিত্ত ঐ সকল আচার্য্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মাচার্য্য বলিতে পারা যায় না। এই সাম্রাজ্য-মধ্যে যদিও গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ভারতবর্ষের মধ্যে স্থাপত্য শিল্পের বহুল পরিমাণে নূতন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রজাহিতকারী গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে যদিও রেলওয়ে লাইন্, তার লাইন্, বহুসংখ্যক বৃহৎ সেতু এবং নানা যন্ত্রাগার ও বিবিধ অট্টালিকা দেখা যায়, কিন্তু সেপ্রকার শিল্পোন্নতি বিষয়ে আর্য্যজাতির ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল শিল্পনৈপুণ্য-কার্য্যে ভারতবাসী কেবল পরিশ্রমজীবীর (কুলী মজুর) কার্য্য করিয়া থাকে ; প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল শিল্প-সম্বন্ধীয় কার্য্যের সহিত ভারতীয় শিল্পোন্নতির কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহার মধ্যে অনুকরণপ্রিয় বাবুদলের ভিতর দুই একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার এবং বক্তা দেখা যায়। ইংরাজী ভাষায় তাঁহারা আপনাদিগের এরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া ইংরাজদিগকেও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এপর্য্যন্ত আপনাদিগের মাতৃভাষায় এমন একজনও এরূপ গ্রন্থকার অথবা সুকবির আবির্ভাব হইল না, যাহাতে আমরা এরূপ বিবেচনা করিতে পারি যে, এপর্য্যন্ত আমাদিগের আর্য্যজাতির মধ্যে তাঁহার দ্বারা ভাষাগত জীবন গঠিত হইতে পারে। যদিও তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন সাধারণ কবি অথবা মিশ্রিত হিন্দীর দুই একজন গ্রন্থকার হইয়াছেন এবং বঙ্গ অথবা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে দুই এক ব্যক্তিকে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় নূতন কবি দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহ দ্বারা জাতিগত ভাষা, জাতিগত জীবন, এবং জাতিগত ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা হয় না। আর্য্য সাহিত্যের সহিত সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই নিমিত্ত তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের সমাজ হইতে একেবারেই সঙ্গীতবিদ্যার লোপ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান-সাম্রাজ্য-কালীন আর্য্যজাতির অবস্থার সহিত গত এক শত বৎসরের অবস্থার তুলনা সাধারণ ভাবে স্থূল উদাহরণের দ্বারা করা হইতেছে। সূক্ষ্ম ভাবে দর্শন করিলে এই বিচারের সত্যতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইবে।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের যে কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই উপর সংক্রমিত হইয়াছে। যে শিল্প এবং বাণিজ্যের দ্বারা ভারত-

বর্ষ জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ভারতের যে শিল্প এবং বাণিজ্যের লোভে উদ্যমশীল ইউরোপবাসিগণ এই ভূমিতে আসিবার নিমিত্ত লোলুপ হইতেন, আজ ভারতবর্ষে সেই শিল্পসমূহের নামমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধিমান্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আজ ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি হইয়াছে এবং অত্রত্য প্রধান বাণিজ্য এক্ষণে বৈদেশিকদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। এ স্থান হইতে তূলা প্রেরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ "দক্ষিণা" দানের ব্যবস্থা করিয়া তবে আর্য্যজাতিকে বস্ত্রাচ্ছাদন দ্বারা আপনাদিগের লজ্জা নিবারণ করিতে হয়। গৃহস্থালী পদার্থ সম্বন্ধেও ইহা বলিতে পারা যায় যে, এক্ষণে সূচী (ছুঁচ) হইতে পর্য্যঙ্ক (পালঙ্গ) পর্য্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ দ্রব্যই বিদেশীয় পরিদৃষ্ট হয়। এ স্থান হইতে অমূল্য রত্নসমূহ প্রেরণ পূর্ব্বক বিদেশীয় কাচনির্ম্মিত দ্রব্যসমূহ আনাইয়া তাহার দ্বারা আজ আর্য্যজাতির গৃহশোভা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শিল্প এবং বাণিজ্য বিষয়ে অধুনা আর্য্যজাতি এরূপ হীনাবস্থ হইয়া গিয়াছে যে, যদি আজ বৈদেশিকগণ আপনাদিগের শিল্প এবং বাণিজ্য দ্বারা এই জাতিকে সহায়তা না করেন, তবে এই জাতি কখনও আপনাদিগের মনুষ্যত্ব রক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। এ সময় আর্য্যজাতির জাতীয় বেশের ত কোন ব্যবস্থাই নাই। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত এবং রাজা মহারাজগণ হইতে সামান্য দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলকেই বিদেশীয় বেশের পক্ষপাতী দেখা যায়। বস্তুতঃ আর্য্যদিগের মধ্যে অধুনা এরূপ প্রমাদযুক্ত রীতি দেখা দিয়াছে যে, বিদ্বান্ হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই ব্যক্তিগত বেশের কিছুমাত্র বিচার না করিয়া একমাত্র বিদেশীয় বেশ "কোট, পাণ্টুলন এবং হ্যাট" প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করিতে তৎপর। ইংরাজী ভাষার অদ্বিতীয় গ্রন্থকার সদে (Southey) সাহেব লিখিয়াছেন যে, "আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ এবং সুন্দর। ইংরাজী এবং জর্ম্মন্ ভাষার পরস্পরে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ থাকায় জর্ম্মন্ ভাষার শব্দসমূহ ব্যবহার করিবার জন্য ক্ষমা করিতে পারা যায়, কিন্তু যে স্থানে ইংরাজী ভাষায় শব্দপ্রয়োগের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়, সেখানে যদি কেহ কোন লাটিন্ বা ফ্রেঞ্চ্ ভাষার শব্দ ব্যবহার করেন, তবে মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ-পাপে তাঁহার প্রতি ফাঁসি দণ্ডের ব্যবস্থা অথবা দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হওয়া উচিত।" বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আপনাদিগের ভাষার নিমিত্ত এরূপ অভিমত

আছে, কিন্তু আমাদিগের আর্য্যজাতির মধ্যে অধুনা এরূপ প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় যে, দিন দিন ভারতবাসিগণ আপনাদিগের মাতৃভাষা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত বিবেচনা করিয়া থাকে। এ সময় ইংরাজীশিক্ষিত আর্য্যগণের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে অসহনীয় ক্লেশের আবির্ভাব হয়। সকল ব্যক্তির নিকট বিদেশীয় ভাষায় বাক্যালাপ করাই সুবিধা বলিয়া বিবেচিত হয়, অথবা যদি কেহ আপনার ভাষায় আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে, তবে বিদেশীয় ভাষার সহায়তা ব্যতীত সে ব্যক্তি স্বীয় মনোগত ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়। এখন ইহাতে এরূপ কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, অধুনা প্রকৃত পক্ষে, ইংরাজীশিক্ষিত সমাজমধ্যে আপনার মাতৃভাষার বিনাশ সাধিত হইতেছে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্ত্রী পতিকে, পতি স্ত্রীকে, মিত্র মিত্রকে, এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে বিদেশীয় ভাষায় পত্র লেখার ব্যবহার করা উপযোগী, হিতকারী এবং সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করে। আরও একটী বিচিত্রতা দেখা যায় যে, আপনার নাম স্বাক্ষর করিবার সময়ও বিদেশীয় ভাবেরই অনুকরণ করা হইয়া থাকে (যথা—রাম লাল লিখিতে R. Lal, উদয় সিংহ লিখিতে U. Singh, ব্রহ্মমোহন শর্ম্মা লিখিতে B. M. Sharma, এবং মহেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিতে M. N. Mitra ইত্যাদি)। এমন কি, ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও অন্ততঃ নাম স্বাক্ষরটী বিদেশীয় ভাষায় অভ্যাস করিয়া লয়।

শিখা সূত্র ধারণ যে আর্য্যজাতির বহিশ্চিহ্ন, যে সকল চিহ্নের সহিত দ্বিজগণের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সংরক্ষিত হইয়া থাকে, সেই আর্য্য-জাতির বর্ত্তমান পথপ্রদর্শক ইংরাজীশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিবর্গের নিকট আজ উপবীত অথবা শিখাধারণ লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রমাদবৃত্তির অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া কখন কখন মনোমধ্যে হাস্যরসের উদয় হইয়া থাকে; আবার কখনও বা ঘোরতর করুণ রসে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যে জাতি এক সময়ে উন্নতির পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া জগতে আদিগুরু রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, হায়! আজ তাহাদিগের এরূপ হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে। যখন আর্য্যজাতির বর্ত্তমান সদাচারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তখন আরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে। সদাচার-হীনতার ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে, অধুনা কি রাজা, কি প্রজা, কি ব্রাহ্মণ,

কি শূদ্র, কেহই প্রত্যক্ষ রূপে আপনাদিগের ধর্ম্মনিন্দা, বিরুদ্ধ আচার গ্রহণ এবং আপনাদিগের সদাচার বিনষ্ট করিয়া অন্ত্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেও আপনার জাতিমধ্যে নিন্দনীয় হয় না। এই কারণে সকল বর্ণমধ্যে স্বেচ্ছাচারপ্রবাহ দিন দিন প্রবলতর ভাবে চলিতেছে *। এই সদাচারহানির এইরূপ মর্ম্মবিদারক ফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যে, আর্য্যজাতীয় পুরুষদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সংজ্ঞা দূরীভূত হওয়ায় তাঁহাদিগের মধ্যে "বাবু সাহেব"রূপী একটী নূতন সংজ্ঞার সৃষ্টি এবং নারীগণের মধ্যে সহধর্ম্মিণীভাব বিলুপ্ত হইয়া "সহচারিণী" রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আর্য্যজাতিগত জীবনের প্রতি যতই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, ততই ক্লেশে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—অনুশাসনের অভাব বশতই সামাজিক পীড়া এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আর্য্যজাতির আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি এবং ক্লেশের অনেক প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই জাতি, সমাজ, ও এই জাতির নিবাসভূমির উপর যে ঘোর আধিদৈবিক বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিচার করিলে স্বদেশহিতৈষীদিগের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইবে। ঘোর মর্ম্মভেদী বহুকালস্থায়ী দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়াছে, ভারতভূমি মহামারীর আবাসভূমি হইয়া গিয়াছে, প্রতিদিন প্রজাক্ষয় এবং অধোগতি হইতেছে। প্রজার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং দুর্গতির নিমিত্তই দেশে পঞ্চতত্ত্বের বিকার হওয়ায় ঋতুবিপর্য্যয়াদি দোষের উৎপত্তি হইয়া বিরাট্ পুরুষের পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে †। অতএব ভারতবর্ষের নানা আধিদৈবিক বিপত্তির উপর বিচার করিলেও ইহা সিদ্ধান্ত হইবে যে,

---

* প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে চারি বর্ণের দ্বারা চারি প্রকার অনুশাসন প্রচলিত ছিল; যথা—ব্রাহ্মণদিগের বাগ্‌দণ্ড, ক্ষত্রিয়দিগের রাজদণ্ড (শরীর এবং ধন সম্বন্ধীয়), বৈশ্যের ব্যবহারদণ্ড এবং শূদ্রের সেবা-দণ্ড। অধুনা এই চারি প্রকার দণ্ডের রীতি এবং শক্তি আমাদিগের সমাজ হইতে সর্ব্বথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

† বিরাট্‌ধাতুবিকারেণ বিষমস্পন্দনাদিনা।
তদঙ্গাবয়বস্থাস্ত জনজালস্থ বৈষমম্॥
দুর্ভিক্ষাবগ্রহোৎপাতমায়াস্তি ...॥ ইতি শ্রীবশিষ্ঠবচনম্।

আর্য্যজাতি এক্ষণে কর্ম্মভ্রষ্ট, তপোভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট, এবং শক্তিভ্রষ্ট হওয়ায় হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিচার দ্বারা ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, নানা প্রকারে লাঞ্ছিত এবং বিড়ম্বিত হইয়াও মুসলমান সাম্রাজ্যকালে এই আর্য্যজাতির সাত্ত্বিক তেজের সেরূপ অনিষ্ট হয় নাই, যেরূপ এই সময়ে প্রতীত হইতেছে। বুদ্ধিমান্, গুণগ্রাহী এবং উদ্যমশীল ইংরাজ জাতি আপনাদিগের স্বাভাবিক উদারতার জন্য অধুনা এই আর্য্যজাতিকে অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা এবং শান্তিসুখ দান করিয়াছে। কিন্তু তমোগুণপ্রাপ্ত আর্য্যসন্তানগণ সেই স্বাধীনতা এবং শান্তি হইতে কোনও লাভবান্ হইতে পারে নাই, অধিকন্তু আপনাদিগের ভ্রান্ত বুদ্ধির নিমিত্ত দিন দিন আরও হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের দ্বারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করিতে পারেন যে, মুসলমান সাম্রাজ্যসময়ে আর্য্য-জাতির চিত্তের দৃঢ়তা আপনাদিগের জাতীয়ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে প্রকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং সে সময়ের জাতিগত লক্ষণ দ্বারা যে প্রকার তাহাদিগের সাত্ত্বিক তেজ সপ্রমাণ হইত, বর্ত্তমান সাম্রাজ্যকালে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের উদারতা এবং অনুগ্রহে যদিও এই জাতি শান্তি এবং সুসময় প্রাপ্ত হইয়াছে, বিদ্যানুরাগী ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় যদিও এই জাতি ইংরাজী শিক্ষার পথে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে, তথাপি জানি না কোন্ দৈব কারণে এই জাতি দিন দিন আপনাদিগের জাতিগত সম্মান রক্ষা বিষয়ে হীন হইয়া পড়িয়াছে। আজিও আপনাদিগের মাতৃভাষা অথবা স্বদেশীয় শিল্পোন্নতির প্রতি এই জাতির কিছুমাত্র দৃষ্টি পরিলক্ষিত হইতেছে না। বৈদিক ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ এবং আর্য্যসদাচারের এরূপ লোপ হইয়াছে যে, ধর্ম্ম এবং সদাচারের বহির্লক্ষণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। জাতিগত উন্নতির লক্ষণ—গুণপক্ষপাত, পুরুষার্থশক্তি এবং জ্ঞান। ঐ বিজ্ঞানানুসারে বলিতে হইবে যে, জাতিগত অবনতির লক্ষণ—দোষদর্শনপ্রবৃত্তি, আলস্য এবং অজ্ঞান। আর্য্যজাতির মধ্যে যদিও পুরাকালে উন্নতির লক্ষণ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এখন কেবল অবনতির লক্ষণগুলি দেখা যায়। তিরস্কার এবং পুরস্কার দ্বারা জাতিগত ভাব রক্ষা হইয়া থাকে, অর্থাৎ আপনার স্বজাতির রীতি অনুসারে প্রত্যেক মনুষ্যসমাজ আপনার সমাজস্থ ব্যক্তি-দিগের অহিত আচরণে তিরস্কার এবং সদাচরণের পুরস্কাররূপ সম্মান প্রদান

দ্বারা আপনার জাতিগত ভাবের রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু অধুনা ভারতবর্ষে এরূপ গভীর শোক এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদিগের আর্য্যজাতি হইতে জাতিগত পুরস্কার অথবা জাতিগত তিরস্কার উভয়প্রকার রীতিই একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইজাতীয় ব্যক্তিবর্গ এখন মাতাপিতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট লজ্জার বিচার করে না, অথবা সমাজ মধ্যে তাহাদিগের নিন্দনীয় হইবার ভয় নাই। ফলতঃ জাতিগত বন্ধনের শিথিলতা বশতঃ আজ আর্য্যজাতীয় মনুষ্যগণ নিরঙ্কুশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই তাহারা অত্যন্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে আর্য্যজাতির লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পুরুষের মধ্যে আমি পুরুষার্থস্বরূপ (পৌরুষং নৃষু), যে জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে নিবৃত্তিপথগামী বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসিগণ পর্য্যন্ত কেবল জগদ্ধিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া একমাত্র পুরুষকার অবলম্বন করিয়া কর্ম্মযোগী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, সেই আর্য্য জাতির মধ্যে এখন নিবৃত্তিসেবী সন্ন্যাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, প্রবৃত্তিমার্গেয় অধিকারী গৃহস্থগণ পর্য্যন্তও আলস্যগ্রস্ত হইয়া উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তপস্যা এবং ত্যাগ বিনষ্ট হওয়ায় আলস্য এবং লোভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণমধ্যে শৌর্য্যনাশ বশতঃ ঘোরতর কামাসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈশ্যগণ উদ্যমহীন হওয়ায় নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। শূদ্রগণ সেবাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ আচারহীন এবং ধর্ম্মজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, এবং রাজভাষা-ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ শাস্ত্রশ্রদ্ধা-বিহীন, স্বেচ্ছাচারী এবং অনার্য্যভাবাপন্ন হইতেছেন। কলিযুগে দানধর্ম্ম প্রধান হইলেও ধনাঢ্য পুরুষেরা কেবল সুখ্যাতি এবং রাজসম্মান লাভের নিমিত্ত দান করিয়া থাকেন। সকল দিকেই এইরূপ নানা বিপরীত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

মুসলমান সাম্রাজ্যকালে আর্য্যজাতির মন্দভাগ্যের ফলে যদিও ঐ সাম্রাজ্যের দ্বারা এই জাতিকে বিস্তর পরিমাণে ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি সে সময় এই জাতির পুরুষার্থ ধর্ম্মানুকূল ছিল। সে সময়ের ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে, সে সময় এই জাতির মধ্যে সাত্ত্বিক তেজ

বর্ত্তমান ছিল, তাই আর্য্যজাতির জাতিগত জীবনের মধ্যেও সবলতা ছিল। ইংরাজ শাসনকালে যদিও আর্য্যজাতির প্রারব্ধ সম্পূর্ণ অনুকূল প্রতীত হইতেছে, কারণ বর্ত্তমান কালে এ প্রকার দেশকালজ্ঞ এবং গুণগ্রাহী সাম্রাজ্যের সহায়তা লাভ করা অত্যন্ত আশা এবং শান্তিজনক হইয়াছে, তথাপি আর্য্যজাতি দিন দিন হীনমতি হইয়া পড়ায় তাহাদিগের মধ্যে সাত্বিক তেজ বিনাশের সহিত জাতিগত ভাবেরও শিথিলতা ঘটিতেছে। তাই তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল দেখিয়া চিন্তাশীল এবং দূরদর্শী মহাত্মগণ সর্ব্বদা চিন্তিত রহিয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুসলমান শাসনকালে আর্য্যজাতির রাজসিক শক্তি হ্রাস হইয়া পড়িলেও তাহাদের মধ্যে সাত্বিক শক্তির বৃদ্ধিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এখন আর্য্যজাতির মধ্য হইতে ধীরে ধীরে সাত্বিক শক্তিও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং চতুর্দ্দিকে কেবল সর্ব্বনাশকারী তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে। এই নিমিত্ত নিঃস্বার্থপ্রেমিক আর্য্যসন্তানগণ আজ ঘোর স্বার্থান্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যজাতির মধ্যে অত্যন্ত কঠিন রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব অতি শীঘ্রই উহার চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ওষধিপ্রয়োগ।

নিয়মই সফলতার বীজমন্ত্র। অনুশাসনের দ্বারাই নিয়ম রক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক অনুশাসনের কারণেই সূর্য্যদেবের নিয়মিত রূপে উদয়াস্ত হওয়ায় নিয়মিতরূপে দিন এবং রাত্রির সমাগম হইয়া থাকে। এই দৈব অনুশাসনের নিমিত্তই জীবের আবশ্যকতানুসারে পবনদেব বায়ুসঞ্চার করিতেছেন, বরুণদেব নিয়মিত সময়ে বারি বর্ষণ করিতেছেন, এবং ষড়্‌ঋতু আপন আপন সময়ে উদয় হইয়া জীবসমূহের পুষ্টি এবং আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। এই প্রকৃতিমাতার অনুশাসনের কারণেই বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি পদার্থনিচয় নিয়মিত সময়ে মনোমোহকর পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া নিয়মিত সময়ে জীবদিগকে ফল দান করিতেছে। এই রাজানুশাসনের ফলে প্রজা শান্তিসুখ উপভোগপূর্ব্বক সংসারপথে অগ্রসর হইতেছে। এই বেদানুশাসনের ফলে ধার্ম্মিকগণ সাধনমার্গ দ্বারা ক্রমোন্নতি করিতে করিতে পরিশেষে দুর্ল্লভ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতেছেন। এবং এই একমাত্র অনুশাসনের ফলেই প্রজা রাজার হিত এবং রাজা প্রজার হিত চিন্তন দ্বারা মনুষ্যসমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অতএব মনুষ্যের ক্রমোন্নতির নিমিত্ত অনুশাসন নিতান্ত আবশ্যক। পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ অনুশাসনকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—যোগানুশাসন, শব্দানুশাসন এবং রাজানুশাসন। রাজানুশাসন শব্দানুশাসনেরই অন্তর্গত হওয়ায় এই দুই প্রকার অনুশাসনের বর্ণনা স্মৃতিসমূহের মধ্যে এক সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিগুণ প্রাকৃতিক প্রবাহানুসারে এই সংসারে ত্রিগুণভেদে মনুষ্যপ্রকৃতিও ত্রিবিধ দেখা যায়, এবং স্বাভাবিকরূপে মানুষী সৃষ্টিমধ্যে তিন প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি নিহিত থাকায়

জীবগণের রক্ষা, তাহাদিগের ক্রমোন্নতি, এবং তাহাদিগের পরমকল্যাণ সাধনার্থ অপৌরুষেয় বেদসমূহমধ্যে ত্রিবিধ অনুশাসনের বর্ণন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক মনুষ্যসমূহের জন্য যোগানুশাসন, রাজসিক মনুষ্যসমূহের নিমিত্ত শব্দানুশাসন, এবং তামসিক অধম জীবসমূহের নিমিত্ত রাজানুশাসন বিহিত আছে। গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার অধিকারীর আধিক্য থাকায় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ একই স্থানে দুই অনুশাসনের বর্ণনা করিয়াছেন। এই তিন প্রকার অনুশাসনের বলে মনুষ্যগণ আপন আপন অধিকারানুসারে নিয়মিত রূপে ক্রমোন্নতি করিতে করিতে পরিশেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সাধকের নিমিত্ত অনুশাসনের আবশ্যকতা আছে, অনুশাসনের অধীন না হইয়া কোন মনুষ্যই ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারে না। অতএব আপন আপন গুণাধিকারানুসারে যথাযোগ্য অনুশাসনের অধীনতা স্বীকার করিলেই মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে।

ত্রিগুণ বিচার দ্বারা মনুষ্যবুদ্ধির ভেদবিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আছে—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ মোক্ষ, এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা যথার্থরূপে নির্ণীত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। যাহার দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য যথাবৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, উহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে, এবং যাহার দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সকল বিচারেই বিপরীত লক্ষ্য হইয়া থাকে, সেই অজ্ঞানাচ্ছাদিত বুদ্ধিকে তামসী বলা যায় *। ফলতঃ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে আত্মার পূর্ণ প্রকাশ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় উহাতে ভ্রম হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; এই কারণে সাত্ত্বিক অধিকারীই বিজ্ঞানাধিকাররূপী যোগানুশাসন প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারে †। কিন্তু

---

* [illegible] নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

† যোগানুশাসনং প্রজ্ঞা শব্দো বুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্তর্ব্বাহিঃ প্রকাশায় বিজ্ঞানজ্ঞানহেতুকম্॥
ইতি জ্ঞানভাষ্যে।

রাজসিক বুদ্ধিতে বিচারশক্তি থাকিলেও কেবল তাহার দ্বারা সদসৎ নির্ণয় করিবার শক্তি না থাকায়, সে সময় সাধকের নিমিত্ত শব্দানুশাসনরূপ বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্রই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু তামসিক বুদ্ধির নিম্নাধিকারিগণের মধ্যে সর্ব্বদা বিপরীত জ্ঞান অবস্থান করায়, তাহাদিগের নিমিত্ত পাশব বল প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে। এ কারণে তাহাদিগের কল্যাণার্থ রাজদণ্ডকারী রাজানুশাসনের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এই তিন অনুশাসনের মধ্যে প্রথম দুইটী মুখ্য এবং তৃতীয়টী গৌণ বিবেচনা করা উচিত। এই কারণে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ রাজানুশাসনকে শব্দানুশাসনান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব বেদপ্রতিপাদ্য স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেই এই দুইএর বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক-বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন পদপ্রাপ্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠাধিকারীদিগের যোগানুশাসনে পূর্ণাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্ত মহর্ষি-অগ্রগণ্য যোগিরাজ মহামুনি পতঞ্জলি "অথ যোগানুশাসনম্" বলিয়া যোগশাস্ত্রের বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই বিদ্বজ্জনশিরোমণি মহর্ষি আগমনিগম-প্রবেশ-দ্বার-রূপ ব্যাকরণশাস্ত্রকে "অথ শব্দানুশাসনম্" বাক্যের দ্বারা প্রারম্ভ করিয়াছেন। যোগানুশাসন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞান বলিয়া উক্ত মহর্ষি ঐ শাস্ত্র সূত্র দ্বারা পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু শব্দানুশাসনের বিস্তার অনন্ত, এই নিমিত্ত বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রসমূহের বিস্তারও অনন্ত। ফলতঃ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি কেবল সেই শব্দানুশাসনের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানভূমির ভেদ হইতে যোগানুশাসনের দুইটী অবস্থা স্বীকার করা যায়। এই নিমিত্ত জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের তারতম্য হইতে যোগীর পরোক্ষানুভূতি এবং অপরোক্ষানুভূতিরূপী যথাক্রমাধিকার লাভ হইয়া থাকে *। উন্নত যোগিরাজগণ যোগানুশাসনের এই দুই ভাবের পার্থক্যানুভব করিতে সক্ষম হয়েন। যোগানুশাসনের পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইবার পর যোগিরাজ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যান।

* ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

সেই সময় তৎকর্ত্তৃক কোন ভ্রম অথবা প্রমাদের কার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন তিনি কেবল ভগবৎকার্য্যই সাধন করিতে থাকেন। অতএব এ সময় যোগানুশাসনরূপী উন্নত অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিক আবশ্যকতা নাই।

আচার্য্যাজ্ঞা এবং শাস্ত্রাজ্ঞার ভেদানুসারে তত্ত্বদর্শীরা শব্দানুশাসনের দুই ভেদ করিয়াছেন। অভ্রান্ত এবং পূর্ণবিজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্‌বাক্যই বেদ *। ঐ বেদসমূহের আজ্ঞা এবং বেদসম্মত স্মৃতি আদি শাস্ত্রের আজ্ঞাকেই শব্দানুশাসন বলা যায়। এবং গুরু ও আচার্য্যের আজ্ঞাও শব্দানুশাসনমধ্যে প্রধান অবলম্বনীয় †। এই ভাবে দুই প্রকারে শব্দানুশাসন রজোগুণপ্রধান অধিকারীদিগের কল্যাণ সাধন করিবার নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে।

যদিও আমাদিগের বেদ এবং শাস্ত্রের মধ্যে জীবহিতকরী সমস্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ আমাদিগের বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্র পূর্ণবিজ্ঞানযুক্ত, তথাপি লোকহিতার্থ আচার্য্যানুশাসনই প্রধানাবলম্বন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বেদ এবং শাস্ত্রের যথার্থ রহস্যজ্ঞান সকল ব্যক্তির হইতে পারে না। বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞান হইলেও আপনাপন অধিকারানুসারে, সাধন নির্ণয় করা সাধারণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সকল প্রকারেই অসম্ভব। এই নিমিত্ত শব্দানুশাসনের দুই বিভাগের মধ্যে আচার্য্য-আজ্ঞাই প্রথমস্থানীয় বলিয়া মনে হয়। গুরু এবং আচার্য্য-শব্দ একই ভাবপ্রকাশক, কেবল আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক বলিয়া গুরু শব্দ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং আচার্য্যশব্দ আধ্যাত্মিক ভাবে এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় উপদেষ্টা বলিয়াও ব্যবহৃত হয় ‡। প্রাচীন কালে সমাজমধ্যে পবি-

---

* প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা॥
ইতি স্মৃতিঃ।

† ধর্ম্মো মূলং মনুষ্যাণাং স চাচার্য্যাবলম্বনঃ।
তস্মাদাচার্য্যসুমনঃশাসনং সর্ব্বতোধিকম্॥
ইতি শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যঃ।

‡ স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ॥
ইতি স্মৃতিঃ।

ত্রতা অধিক ছিল বলিয়া বুদ্ধির নির্ম্মলতাও অধিক ছিল। কিন্তু এই অজ্ঞানযুক্ত কলিযুগে মনুষ্যের বুদ্ধি অত্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। অতএব আচার্য্যানুশাসনের আরও দৃঢ়তা হওয়া উচিত।

ইহা বিবেচনা করিয়া শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যজী মহারাজ আচার্য্যানুশাসনের

আচার্য্যঃ কস্মাদাচারং গ্রাহয়ত্যাচিনোত্যর্থানাচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা।
ইতি যাস্কমুনিঃ।

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাত্তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥
ইতি স্মৃতিঃ।

আচার্য্যগুরুশব্দৌ দ্বৌ সদা পর্য্যায়বাচকৌ।
কশ্চিদর্থগতো ভেদো ভবতোবং তয়োঃ ক্বচিৎ॥
উপপত্তিকমংশন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রস্য পণ্ডিতঃ।
ব্যাচষ্টে ধর্ম্মমিচ্ছূনাং স আচার্য্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বদর্শী তু যঃ সাধুর্মুমুক্ষূণাং হিতায় বৈ।
ব্যাখ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রাংশং ক্রিয়াসিদ্ধিপ্রবোধকম্॥
উপাসনাবিধেঃ সম্যগীশ্বরস্য পরাত্মনঃ।
ভেদান্ প্রশাস্তি ধর্ম্মজ্ঞঃ স গুরুঃ সমুদাহৃতঃ॥
সপ্তানাং জ্ঞানভূমীনাং শাস্ত্রোক্তানাং বিশেষতঃ।
প্রভেদান্ যো বিজানাতি নিগমস্যাগমস্য চ॥
জানন্ চাধিকারাংস্ত্রীন্ ভাবতাৎপর্য্যলক্ষণঃ।
তন্ত্রেষু চ পুরাণেষু ভাষায়াস্ত্রিবিধাং স্থিতিম্॥
সম্যগ্ভেদৈর্বিজানাতি ভাষাতত্ত্ববিশারদঃ।
নিপুণো লোকশিক্ষায়াং শ্রেষ্ঠাচার্য্যঃ স উচ্যতে॥
পঞ্চতত্ত্ববিভেদজ্ঞঃ পঞ্চ ভেদান্ বিশেষতঃ।
সগুণোপাসনাং যস্তু সম্যগ্ জানাতি কোবিদঃ॥
চতুষ্টয়েন ভেদেন ব্রহ্মণঃ সমুপাসনাম্।
গম্ভীরার্থাং বিজানীতে বুধো নির্ম্মলমানসঃ॥
সর্ব্বকার্য্যেষু নিপুণো জীবন্মুক্তস্ত্রিতাপহৃৎ।
করোতি জীবকল্যাণং গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ স কথ্যতে॥
ইতি বিজ্ঞানভাষ্যম্।

প্রাধান্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান দেশকালপাত্রোপযোগী অনেক নিয়ম করিয়া গিয়াছেন এবং চারিটী মঠের মর্য্যাদা বন্ধনপূর্ব্বক মঠাম্নায় আদি অনুশাসন গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন দ্বারা আর্য্যজাতির ক্রমোন্নতির নিমিত্ত বিস্তর সুগম উপায় করিয়া গিয়াছেন। গুরু এবং আচার্য্যপদের মর্য্যাদা স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত এবং আচার্য্যের রীতি নীতি ও অধিকার মধ্যে যাহাতে কোন বিভিন্নতা না হয়, তাহার নিমিত্ত চারিটী আচার্য্যকে প্রধান করিয়া ভারতের চারিদিকে স্থাপন করিয়াছেন। চারিটী আচার্য্য-পীঠ-স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে, ইহার সাহায্যে ব্রাহ্মণের দ্বারা ক্ষত্রিয় রাজগণ সহায়তা প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয় নৃপতি-বর্গের দ্বারা সংরক্ষিত হইলে আর্য্যজাতির জাতিগত জীবনের রক্ষা এবং উন্নতি হইতে পারে *। যদি সেই উন্নতিবিষয়ক নিয়মে কোনও বাধা উপস্থিত হয়, তবে এই চারি পীঠাধিপতি পরস্পরে একত্র হইয়া অথবা স্বতন্ত্ররূপে সেই বিঘ্ন দূর করিবার জন্য তৎপর হইতে পারেন। কারণ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মবক্তা এবং রাজগণই ধর্ম্মপালক †; উভয়ের কার্য্য যথাযোগ্য বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি উভয়ে স্ব স্ব অধিকারানুসারে কার্য্য না করেন, অথবা যদি একজন অপরকে অনাদর করেন, তবে সেই সময়ে অনুশাসনপূর্ব্বক সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার নিমিত্তই এই চারিটী পীঠাধিপতির উচ্চতর অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল।

যে প্রকার যোগানুশাসনের দুই ভেদ এবং শব্দানুশাসনের দুই ভেদ আছে, সেই প্রকার লৌকিক দণ্ডেরও দুই প্রকারের ভেদ আছে বলা যায়। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের মধ্যে তিন প্রকার দণ্ড অবধারিত আছে; যথা—প্রথম সমাজদণ্ড, দ্বিতীয় রাজদণ্ড এবং তৃতীয় যমদণ্ড;—কিন্তু যমদণ্ডই পারলৌকিক দণ্ড, স্থূল শরীরের সহিত তাহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় সাধারণ নিয়মানু-সারে তাহা গণ্য করিবার আবশ্যকতা নাই। অতএব তৃতীয় অনুশাসনকে রাজদণ্ড এবং সমাজদণ্ড এই দুই বিধি অনুসারে কেবল দুই ভাগেই বিভক্ত

---

* নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ সংপৃক্তমিহামুত্র চ বর্দ্ধতে॥
ইতি শ্রীমনুঃ।

† ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবক্তা চ রাজা ধর্ম্মপ্রপালকঃ।
ইতি স্মৃতিঃ।

করা যাইতে পারে। কলিযুগে তমঃপ্রধান প্রজার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অতএব কলিযুগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই নিমিত্ত প্রত্যক্ষ দণ্ডের আবশ্যকতা আছে। কারণ এই প্রমাদযুক্ত কালে সকলেরই প্রমাদ হইবার সম্ভাবনা। সাধারণ প্রজার নিমিত্ত দণ্ডই একমাত্র রক্ষক। এই নিমিত্ত স্মৃতি আদি শাস্ত্রে দণ্ডকে ধর্ম্মরূপ বলিয়া উহার অত্যন্ত অধিক মহিমা কীর্ত্তিত আছে *।

বিচারের দ্বারা ইহা স্থির হইবে যে, যোগানুশাসনের দুই ভেদ সাধারণের পক্ষে বিহিত নহে; কিন্তু অন্য দুই অধিকার অর্থাৎ শব্দানুশাসন এবং রাজানুশাসন সাধারণের পক্ষে অবধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দানুশাসনের দুই অধিকারের মধ্যে আচার্য্যানুশাসন এই সময়ে অধিক হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু আচার্য্যানুশাসন রাজদণ্ডের আশ্রয়েই পরিচালিত হইতে সমর্থ।

এই সময়ে ভারতবর্ষের সম্রাট্ অন্যধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, রাজদণ্ডের সম্পূর্ণ সহায়তা আর্য্যজাতি প্রাপ্ত হইতে পারে না; কিন্তু সমাজদণ্ডের পুনঃপ্রবর্ত্তন করা আর্য্য প্রজার হস্তেই আছে। অতএব এই সময়ে সামাজিক অনুশাসনের দ্বারাই আর্য্যজাতির কল্যাণ হইতে পারে। সামাজিক অনুশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজদণ্ড এবং সমাজদণ্ড উভয় প্রকার কার্য্যই সাধিত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য্যানুশাসন এবং শাস্ত্রানুশাসনের প্রচার সম্বন্ধেও সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সমাজানুশাসনের উন্নতি ব্যতীত আর্য্যজাতির এই ঘোর দুঃখদায়িনী পীড়ার নাশ কদাচিৎ হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন কালে যে

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেতে মনুষ্যবর্ত্ম নি স্থিতাঃ॥
নাভীতো যজতে রাজন্নাভীতো দাতুমিচ্ছতি।
নাভীতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সময়ে স্থাতুমিচ্ছতি॥
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি॥
ইতি মনুঃ।

প্রকার সামাজিক অনুশাসনের রীতি ছিল, তাহার কিছু পরিবর্ত্তনও করিতে হইবে। দেশ, কাল, পাত্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা রুচি এবং অধিকারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব প্রাচীন কালে গ্রাম এবং নগরে যে সমাজপতির প্রতি অধিকার প্রদত্ত হইবার রীতি ছিল, সে সময় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতির নিমিত্ত যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "পঞ্চায়ত" স্থাপন করিবার বিধান ছিল, সেই সময় বংশপরম্পরায় যে কিছু অধিকার প্রদত্ত হইত এবং এক গ্রাম অথবা নগরের সহিত দ্বিতীয় গ্রাম অথবা নগরের এ বিষয়ে কোন বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষিত হইত না, এক দেশ বা নগরের "পঞ্চায়তের" সহিত দ্বিতীয় দেশ অথবা নগরের "পঞ্চায়তের" কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার রীতি ছিল না, সেই সকল রীতিতে এ সময়ের উপযোগী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা হইবে। এই সময়ের দেশ কাল পাত্রানুরূপ নিয়ম প্রস্তুত করিয়া সামাজিক অনুশাসন স্থাপন করিতে হইবে। "পঞ্চায়তী-শক্তি" অর্থাৎ "সঙ্ঘশক্তির" প্রথা এই দেশেও বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। এখন উহাকে সংস্কৃত করিয়া উন্নত করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ ব্যাসদেবও স্পষ্ট শব্দে বলিয়া গিয়াছেন যে, অন্যান্য যুগে অন্যান্য শক্তি কার্য্যকারিণী হইলেও কলিযুগে কেবল "সমূহ-শক্তি" অর্থাৎ "পঞ্চায়তী শক্তি" একমাত্র ফলপ্রদ হইবে *।

অধুনা সামাজিক অনুশাসনের বিস্তর প্রশংসনীয় রীতি ইউরোপ এবং আমেরিকার মনুষ্যসমাজে দেখা যায়। তথায় অন্য উপধর্ম্ম এবং অনার্য্য রীতিসমূহ প্রচলিত থাকায় তত্রত্য মনুষ্যসমাজমধ্যে অনেক প্রকারের সামাজিক শিথিলতা দেখা যায়; কিন্তু সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার যে কিছু রীতি ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে, সেই সকল রীতি অত্যন্ত দৃঢ় নিয়মযুক্ত এবং প্রশংসনীয়। তত্রত্য নরসমাজে বহুবিধ সামাজিক অনুশাসন এরূপ দৃঢ় এবং শক্তিশালী যে, তাহার দ্বারা রাজা ব্যতিরেকেও আপনার দেশের সম্পূর্ণ রাজসিক ব্যবস্থা চালিত করিবার প্রথা কোন বিশেষ বিশেষ দেশে প্রচলিত হইতেছে। ফ্রান্স এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্

* ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে।
দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে॥
ইতি শ্রীব্যাসঃ।

প্রজাতন্ত্র রাজনিয়ম (Republican form of Governmet) সেই সামাজিক অনুশাসন শক্তির অসাধারণ ফল। আর্য্যপ্রজার সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পবিত্র বিচারানুসারে রাজাকে না রাখিয়া প্রজাতন্ত্র রাজ্যস্থাপন করা সর্ব্বথা নিন্দনীয়, পাপজনক এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বিবেচিত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কার্য্য যতই উন্নত হউক না কেন, "অতি" সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়। মনুষ্যজাতি এবং দেশের স্থায়ী মঙ্গল তখনই হইতে পারে, যখন রাজা এবং প্রজা উভয়ের মধ্যে কাহারও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকে। রাজনীতির বিচারে, রাজা এবং প্রজা উভয়ের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইলে, উভয়ের স্বাধীনতা অবলম্বনে রাজ্যশাসনের রীতি, যাহা প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা অত্যন্ত দৃঢ় এবং দূরদর্শিতার দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। যদি এরূপ না হইত, তবে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, অপার শক্তিশালী চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইয়াও, জনৈক ক্ষুদ্র প্রজার তুষ্টিজন্য আপনার সহধর্ম্মিণী পরমা সতী সীতা দেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত রাজধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিতেন না। তবে এখন যেরূপ লৌকিক বল প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রথা ইউরোপাদিতে প্রচলিত আছে, ঐ প্রকার প্রথা পুরাকালে ভারতে ছিল না। তখন একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন দ্বারা সকল দিক্ সুরক্ষিত হইত।

রাজনীতির বিচারে যদিও আজকাল ইউরোপীয় জাতি নানাবিধ নূতন আবিষ্কার করিয়া দেখাইতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের রাজনীতি-বিজ্ঞান সদা পরিবর্ত্তনশীল দেখা যাইতেছে; কিন্তু আর্য্যরাজনীতি অপরিবর্ত্তনশীল এবং দৃঢ়। ইউরোপ এক্ষণে লিবারল (Liberal), কন্সর্‌বেটিভ (Conservative) আদি মন্ত্রিসভা সংগঠনপ্রণালী, এবং লিমিটেড্ মনার্কি (Limited monarchy)-রূপী রাজতন্ত্রবিধি, এবং রিপাব্‌লিক (Republic)-রূপী প্রজাতন্ত্রবিধি আদি নানা রাজনীতি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু আর্য্যবিজ্ঞানের সম্মুখে ঐ সমস্তই অসম্পূর্ণ। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রজাতন্ত্র ভাব স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে প্রজাতন্ত্র ভাব অধর্ম্মের ভাবী আলয় বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি বিচার করিয়া দেখা যায় যে, মনকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রপক্ষপাতী ব্যক্তিরা যদিও আপনাদের রাজ্যের নাম প্রজাতন্ত্র-রাজ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সেই সকল প্রজার মধ্যে কোন এক যোগ্য

ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত তাহাকে রাজা পদবী প্রদত্ত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সেই প্রধান ব্যক্তি রাজাই হইয়া থাকেন।

সৃষ্টিকৌশল বিচার দ্বারা ভারতবাসীরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জীবের মধ্যে জ্ঞানপ্রভেদ থাকা স্বতঃসিদ্ধ; এই কারণে তাহাদিগের মধ্যে গুরুশক্তি এবং লঘুশক্তির বিচার রক্ষা অপরিহার্য্য। প্রজা হইতে রাজা পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত এবং অজ্ঞানী হইতে পূর্ণজ্ঞানবান্ পর্য্যন্ত, সকল প্রকার অধিকারীর মধ্যে লঘুশক্তি এবং আজ্ঞাকর্ত্তা গুরুশক্তি, প্রজা এবং রাজভাব, শিষ্য এবং উপদেশকভাব, আজ্ঞাপালক এবং আজ্ঞাকর্ত্তা ভাবের স্বতন্ত্রতা থাকা অবশ্য সম্ভব। এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা নিশ্চয় হইবে যে, কেবল প্রজাই রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি, এই উভয়ের কার্য্য আবহমানকাল পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না। যদি প্রজাকে কোন কৌশল দ্বারা সম্পূর্ণ রাজশক্তি প্রদত্ত হয়, তবে এক সময় না এক সময় তাহাদিগের সেই অধিকার তাহাদিগের বিপত্তিরই কারণ হইয়া উঠিবে। এই অভ্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ফ্রান্স দেশে অনেকবার রাজনৈতিক বিপ্লব হইয়াছে। এবং বুদ্ধিমান্‌গণ ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎকালেও ফ্রান্স এবং আমেরিকাদি প্রজাতন্ত্র রাজ্যে পুনরায় ঘোর রাজ্যবিপ্লব হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই বৈজ্ঞানিক বিচারের উপর অবস্থান পূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যগণ আপনাদিগের দৃষ্টি এই প্রকার স্বতন্ত্রতার প্রতি নিক্ষেপ করেন নাই। প্রজাতন্ত্র রাজ্যপ্রণালীর বিষয়ে কেবল আমাদিগেরই এই মত নহে, বড় বড় মননশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই নূতন রাজনীতির দোষ অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা স্বীকার করেন যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজাশাসন-প্রণালীর মধ্যে যদ্যপি অদূরদর্শিতা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান সম্রাট্ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসনপ্রণালী আর্য্যদিগের প্রাচীন রাজ্যশাসনপ্রণালীর সহিত কিয়ৎপরিমাণে মিলিতে দেখা যায়। যেরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসনপ্রণালীকে পূর্ণরূপে রাজতন্ত্রও বলা যায় না এবং পূর্ণরূপে প্রজাতন্ত্রও বলা যায় না, অথচ উহাতে রাজার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যেও ঐরূপই ছিল। কেবল এইমাত্র ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজানুশাসনপ্রণালীতে রাজার অধিকার সঙ্ঘশক্তি

দ্বারা সংযত করা হইয়াছে, এবং প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে রাজার শক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-মর্য্যাদা দ্বারা সংযত করা হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী এজন্য অপেক্ষাকৃত অনুকূল বলিয়াই এই সময় শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহারা ভারত শাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের রাজনৈতিক কৌশলের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্য সিদ্ধান্ত হইবে যে, তত্রত্য মনুষ্যদিগের মধ্যে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার প্রশংসনীয় রীতিসমূহ প্রচলিত আছে। তত্রত্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নানা বিদ্যা সম্বন্ধীয় সভাসমূহের গঠনপ্রণালীর বিচার দ্বারা এই সময় আর্য্যগণ আপনাদিগের জাতির মধ্যে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য নিঃসন্দেহ বহুল পরিমাণে লাভবান্ হইতে পারেন। সেই সকল দেশে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তত্রত্য মনুষ্যগণ রাজনৈতিক ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে বহু প্রকারে লাভবান্ হইতেছেন, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের এতই উন্নতি হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের আর্য্য প্রজা তাঁহাদিগের ঐ সকল রীতি নীতির সাহায্যে আপনাদিগের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত সামাজিক অনুশাসনবিধি লাভ করিতে পারেন। উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতে পারা যায়—যেমন ব্রিটন্ দ্বীপের অধিবাসিগণ সমস্ত রাজ্যমধ্যেই ব্যবসায় এবং ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত "কো-অপারেটিভ্ ইউনিয়ন্" (Co operative Union) নামে যে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহার সফলতার বিচার করিলে ভারতবাসিমাত্রেই চকিত হইবেন। এই মহাসভার দ্বারা ব্রিটিশজাতি অল্প কালের মধ্যে এরূপ বৃহৎ লৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহার সুব্যবস্থানুসারে সমস্ত রাজ্যমধ্যে সহস্র সহস্র শাখাসভা স্থাপিত হইয়া গিয়াছে এবং তথায় এরূপ গ্রাম অথবা নগর নাই যে, যে স্থানে ধন এবং ব্যবসায়ের বৃদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগের স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। এই ব্যবসায় সম্বন্ধীয় মহাসভার শাখাসমূহ কেবল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে নহে, পরন্তু ইহার একটী বৈদেশিক বিভাগের সহায়তায় ইহার অনেক শাখা ইউরোপ এবং আমেরিকার সকল রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। সমাজের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ এই সভার সভ্য আছেন এবং জাতীয় ধনসমাগম এবং

ব্যবসায়ের নিয়মবদ্ধ উন্নতির নিমিত্ত মহাসভা যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেন। বাণিজ্য সম্বন্ধে নৃপতিগণকে এই মহাসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। এবং বাণিজ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা লোকসমাজে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত এই মহাসভা প্রধান সহায়ক। এই প্রকারে ব্রিটিশ জাতির রাজনীতিক মহাসভার সভ্যগণের নির্ব্বাচনপ্রণালী, ঐ রাজ্যের বৈজ্ঞানিক মহাসভা এবং তাহার শাখাসমূহের গঠনপ্রণালী, এবং তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়াদি বিদ্যাপ্রচারসম্বন্ধীয় সভাসমূহের প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপ্রণালী-আদির প্রতি যতই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, ততই ঐ জাতির সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার অসাধারণ যোগ্যতা উপলব্ধি করা যায়। আমাদিগের আর্য্যজাতির এ সময় আপনাদিগের সমাজে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, সমাজোন্নতি এবং বিদ্যাপ্রচারের নিমিত্ত অবশ্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার প্রশংসনীয় রীতি হইতে অনেক উপযোগী নিয়মের সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, যে কিছু সহায়তা গ্রহণ করা যাইবে, তাহাতে যেন ধর্ম্ম এবং আচার-বিরুদ্ধ ফল উৎপন্ন না হয় এরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং কেবল সামাজিক অনুশাসন দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ রীতি গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আর্য্যজাতির মধ্যে সামাজিক অনুশাসনের ধর্ম্মযুক্ত প্রণালী প্রচলিত করিবার নিমিত্ত এবং উহার দ্বারা ভারতবর্ষব্যাপিনী এক সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত আর্য্যজাতির এক্ষণে বিচার, ধৈর্য্য এবং দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করা উচিত। "শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলকে"—যাহার সহিত স্বাধীন হিন্দুনৃপতি এবং ধর্ম্মাচার্য্য হইতে সকল সামাজিক নেতা সংস্কৃত অধ্যাপক এবং যোগ্য পুরুষ-গণ সংযুক্ত আছেন, এবং সর্ব্বসাধারণ আর্য্য প্রজাও যাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া সংযুক্ত হইতে পারেন, এমন কি, কুলকামিনীগণও যাহাতে যোগদান করিয়া ধর্ম্ম এবং যশোলাভ করিতে পারেন,—যে বিরাট্ সভার দ্বারা ধর্ম্মোন্নতি, সমাজসংস্কার এবং বিদ্যাপ্রচার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকারের পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে, এরূপ মহাসভাকে—হিন্দুজাতির একমাত্র বিরাট্ ধর্ম্মসভা বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের কর্ত্তব্য। এই বিরাট্ সভার সহায়তায় এরূপ প্রযত্ন হওয়া উচিত যে, যাহাতে ভারত-

বর্ষের মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যভারত, রাজপুতানা, :পঞ্জাব, ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং বাঙ্গালা আদি প্রান্তে এক একটী স্বতন্ত্র প্রান্তীয় কেন্দ্ররূপে এক একটী ধর্ম্ম-মণ্ডল স্থাপন করা হয়। ভারত-উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মহারাজ দ্বারা স্থাপিত চারিটী মহাপীঠের মধ্যে যে জোষীমঠ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার পুনঃসংস্কার করিয়া চারিটী মঠের শ্রীবৃদ্ধি এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-স্থান-সমূহের উন্নতি করিয়া আচার্য্য-মর্য্যাদা পুনঃ স্থাপিত করা হউক। যে যে ধর্ম্ম-মণ্ডলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যমঠের সহিত আছে, সেই সেই মঠের অধীশ্বরগণকে সেই সেই প্রান্তীয় মণ্ডলের সভাপতিপদ প্রদত্ত হউক। এবং অন্য-প্রান্তীয় মণ্ডলীসমূহের সভাপতিপদের তদ্দেশবাসী সাম্প্রদায়িক প্রধান আচার্য্য অথবা তত্রত্য সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের স্থান না থাকিলে, অথবা কোন অসুবিধা হইলে তত্রত্য সেই প্রান্তবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব নরপতিকে সভাপতিপদে নিযুক্ত করা হউক। এইরূপে প্রান্তীয় ধর্ম্মমণ্ডলের অধীন প্রত্যেক নগর এবং গ্রামে ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইলে সেই সকল শাখাধর্ম্মসভার সভাপতি এবং মন্ত্রিপদে সেই সকল স্থানের সামাজিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ করা হউক। মহামণ্ডল, প্রান্তীয় মণ্ডল, এবং শাখাধর্ম্মসভাসমূহ পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আপন আপন অধিকারানুসারে কার্য্য করিতে থাকুন। এবং আবশ্যক হইলে পরস্পরের অনুশাসন স্বীকার করিয়া এবং পরস্পরের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আপনাপন শক্তি এবং কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি করুন।

সমগ্র ভারতবর্ষে দশ অথবা দ্বাদশ ধর্ম্মমণ্ডল এবং তাহাদিগের অধীন সহস্র সহস্র ধর্ম্মসভা যদি একমত হইয়া ধর্ম্মপুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তবে অল্পদিনে আর্য্যজাতির মধ্যে সামাজিক ধর্ম্মশক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। মহামণ্ডল এবং প্রান্তীয় মণ্ডল লোকসংগ্রহ এবং ধনসংগ্রহ দ্বারা আপন শক্তি বৃদ্ধি করিয়া উহার শাখাসভাসমূহকে রক্ষা করিবেন। এবং শাখাসভাসমূহ সাক্ষাৎরূপে বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মের উন্নতি করিয়া জ্ঞানবিস্তারের সহায়তায় আপনা-দিগের সভার অধিকার দৃঢ় করিয়া জাতি এবং দেশের উন্নতিতে যত্নবান্ হইবেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ নিরঙ্কুশ ব্যক্তিসমূহকে তিরস্কৃত করিয়া সমাজের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করিয়া

প্রজাকে ধার্ম্মিক করিবেন। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সামাজিক শক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে তিরস্কারের অথবা পুরস্কারের আবশ্যকতা আছে, তাহা রাজার কার্য্য। সভার দ্বারা সে কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে? প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, রাজদণ্ড এবং সমাজদণ্ড উভয়ই যোগ্যতার সহিত প্রযুক্ত হইলে সমান ফল প্রদান করিতে পারে। স্বাধীন নৃপতিবর্গের রাজ্যমধ্যে মহামণ্ডলের প্রেরণার দ্বারা তিরস্কার এবং পুরস্কার-রীতি সহজে প্রচলিত করিতে পারা যায়। কিন্তু সকলের স্বাধীনতা-প্রদাতা ব্রিটিশ রাজ্যমধ্যে সামাজিক শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তিরস্কার এবং পুরস্কারের মর্য্যাদা-বন্ধন স্থাপন করা অবশ্য কিছু কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মহামণ্ডল এবং প্রান্তীয় মণ্ডল এবং শাখাসভাসমূহের অনুশাসন-ব্যবস্থা (Organization) উত্তম হইলে অবশ্যই এই কার্য্য সুগমতার সহিত পরিচালিত হইবে। শ্রীমহামণ্ডলের এই কার্য্যবিভাগ দ্বারা ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প, বিজ্ঞান, আচার, সমাজনীতি-আদির উন্নতি লক্ষ্য করিয়া যোগ্য পাত্রদিগের উপাধি, মানদ্রব্য, মানবস্ত্র-আদি দ্বারা আর্য্যজাতির পক্ষ হইতে সম্মানিত করিবার সুকৌশলপূর্ণ নিয়ম করিয়া শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল অনেক প্রকারে লাভবান্ হইতে পারিবে।

উপযুক্ত বিদ্বান্, সদাচারসম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিবর্গকে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য অধিকারানুসারে, অর্থের সহায়তা প্রদানপূর্ব্বক উপাধি প্রভৃতির দ্বারা ভূষিত করিয়া এবং তাঁহাদিগের সন্তোষার্থে সমাজমধ্যে সম্মানের মর্য্যাদা বাঁধিয়া দিয়া পুরস্কারের রীতি প্রচলিত করা ত সমাজেরই হস্তে আছে, এবং ঐ সকল সামাজিক সম্মানকে, নীতিজ্ঞ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও প্রকারান্তরে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অযোগ্য ব্যক্তির তিরস্কার এবং শাসন করিবার রীতি প্রচলিত করা অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই জাতীয় বিরাট্ ধর্ম্মসভার গঠন-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইলে সেই কার্য্যও সহজে চলিতে পারিবে। অসম্মানের বিচার, লোকসমাজের ভয় এবং জীবনের সুখসমূহে অসুবিধা-আদি দণ্ডের দ্বারা হইয়া থাকে। যদি মহামণ্ডলের ব্যবস্থা দৃঢ় হয়, তবে অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিজ রীতি অনুসারে শাখাসভাসমূহ সামাজিকরূপে দণ্ডিত অবশ্যই করিতে সক্ষম হইবে। যদি নগর অথবা গ্রামের মধ্যে এই মহাসভার উদ্দেশ্য এবং আর্য্যজাতির এ সময়ে কর্ত্তব্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা আর্য্য প্রজাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে

সেই নগর বা গ্রামের "পঞ্চায়তি-শক্তি", পূর্ব্বকালের ন্যায় দৃঢ় হইয়া অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে তিরস্কার আপনা আপনিই করিতে পারে। ফলতঃ প্রাচীন পঞ্চায়ত-মণ্ডলীর কার্য্যভার আধুনিক শাখাধর্ম্মসভাসমূহই গ্রহণ করুন এবং তত্রত্য সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় আপনাদিগের শক্তি কার্য্যক্ষম করুন। এইপ্রকার অনুশাসন কার্য্যের সংরক্ষণের ভার লইয়া শাখাসভাসমূহ এ বিষয়ে ধর্ম্মানুরূপ কার্য্য করে কি না, তাহা দেখিবার এবং সংশোধন করিবার ভার প্রান্তীয় মণ্ডলসমূহের ধর্ম্মাচার্য্য সভাপতিদিগের উপর নির্ভর থাকা উচিত।

আজি পর্য্যন্তও গুজরাট এবং দক্ষিণ প্রান্তে পীঠাধীশ ধর্ম্মাচার্য্যগণের হস্তে এইপ্রকার শক্তি কিছু কিছু রহিয়াছে। আজিও যে যে স্থানে তাঁহাদিগের শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তত্রত্য নগর অথবা গ্রামে ধর্ম্ম অথবা সমাজসম্বন্ধীয় কোন জটিল মীমাংসার আবশ্যকতা হইলে পীঠাধীশগণ আপনাদিগের আজ্ঞা-পত্র এবং পীঠের চিহ্নাদি প্রদানপূর্ব্বক কোন যোগ্য ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিকে সেই স্থানে পাঠাইয়া তত্রত্য প্রজাসমূহের সম্মতিক্রমে সেই সামাজিক অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদের নিরাকরণ করিয়া থাকেন এবং সেই সম্বন্ধে যাহার দোষ নির্ণীত হয়, তাহার উপর সামাজিক শাসনের আজ্ঞা প্রদান করেন। যখন আজি পর্য্যন্তও এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তখন এই প্রশংসনীয় রীতিকে নিয়মবদ্ধ করিতে করিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রান্তে প্রচলিত করা অসুবিধা-জনক হইবে না। পরন্তু যদি লোকলজ্জার প্রভাব মনুষ্যের চিত্তের উপর পতিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে প্রথমাবস্থায় মহামণ্ডলের প্রান্তীয় সভাপতি-দিগের অথবা প্রধান সভাপতি-আদির হস্তাক্ষরযুক্ত অনুশাসনপত্র দ্বারাই বিরুদ্ধপথাবলম্বী মনুষ্যগণ অথবা প্রমাদগ্রস্ত দাতৃগণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারে। আর যদি ইহার দ্বারাও ফল না হয়, তবে এতাদৃশ বৃহৎ বিরাট্ শক্তির সহায়তা দ্বারা ভারতবর্ষের সকল সমাজে তাঁহাদিগের অকীর্ত্তি বিস্তার হইবার ভয়ও বহুল পরিমাণে কার্য্যকারী হইবে। এইপ্রকার সুকৌশলপূর্ণ যত্ন দ্বারা এই বিরাট্ ধর্ম্মসভার সহায়তায় শাখাসভাসমূহ সামাজিক দণ্ডের প্রচার দ্বারা ধর্ম্মোন্নতি করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিরস্কারের সহায়তা গ্রহণ গৌণ উপায়; ফলতঃ যোগ্য ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত

করিলেই অযোগ্য ব্যক্তিগণ সাবধান হইতে থাকেন এবং গুণী ব্যক্তিদিগের উৎসাহ আপনা আপনিই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহামণ্ডলের সহায়তায় শাখাধর্ম্মসভাসমূহের দ্বারা উত্তম উত্তম সুন্দর নিয়ম প্রস্তুত করিয়া সুকৌশলপূর্ণ যুক্তির সহিত প্রযত্ন করিলে, আচার্য্যানুশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে। মহামণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশবিভাগ দ্বারা শাস্ত্রানুশাসনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। এবং শাখাসভাসমূহ শক্তিসম্পন্ন হইলে, সামাজিক অনুশাসন দৃঢ় হইয়া সমাজদণ্ডের সহায়তায় আর্য্যজাতির পুনরুন্নতি এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে বর্ত্তমান অধঃপতিত আর্য্যজাতির মধ্যে সামাজিক অনুশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে, আর্য্য-জাতিগত মহারোগের শান্তি হইতে পারিবে। কিন্তু এইপ্রকার ব্যবস্থাবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের নেতা ব্রাহ্মণ এবং বর্ণের গুরু এবং আশ্রমের নেতা সন্ন্যাসীদিগের বর্ত্তমান আচার-বিচার-সমূহের সংস্কার অবশ্যই হওয়া উচিত। এই উভয় সম্প্রদায়ই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয়। অতএব উঁহাদিগের পুনরুন্নতি ব্যতীত আর্য্যজাতির স্থায়ী উন্নতি হইবে না। ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের প্রধান, ব্রাহ্মণই আর্য্য প্রজার সর্ব্বদা চালক হইয়া আসিতেছেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ যেরূপ যোগ্যতাপ্রাপ্ত হইবেন, সমাজমধ্যে তাঁহাদের যতই আদর বৃদ্ধি হইবে, ততই চতুর্ব্বর্ণের কল্যাণ সাধিত হইবে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতির উপরই প্রধানতঃ আর্য্যজাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

তমোগুণের আধিক্যনিমিত্ত এবং ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বিদ্যার নিতান্ত অভাব হওয়ায় এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টি বহুল পরিমাণে অর্থের উপর পতিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণগণ তপঃসাধন বিস্মৃত হইয়াছেন। অতএব বিদ্যাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যতই ব্রাহ্মণগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ধন ও সুবর্ণাদি তাঁহাদিগের প্রকৃত সম্পত্তি নহে, পরন্তু বিদ্যাই তাঁহাদিগের সম্পত্তি,—যতই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐশ্বর্য্য তাঁহাদিগের প্রকৃত ভূষণ নহে, পরন্তু ত্যাগ এবং তপস্যাই তাঁহাদিগের প্রকৃত ভূষণ, ততই এই জাতির পুনরুন্নতি হইবে। সমাজমধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত যে, ধন দ্বারা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদার পরীক্ষা না হয়; পরন্তু কেবল তপঃশক্তি, ত্যাগপ্রবৃত্তি এবং বিদ্যার উপর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। যাহাতে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের

ব্রাহ্মণ, ভ্রাতৃসম্বন্ধে পরস্পর একত্র হইতে পারেন, এরূপ যত্ন করিতে হইবে। যদি মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি দেশবিভাগসমূহ হইতে যে ব্রাহ্মণ জাতির বিভাগ আবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের মধ্যে যে সকল অনাচার আছে, তাহা দূরীভূত করিতে করিতে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে সকল সদাচার আছে, পরস্পরে তাহা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতি হইতে পারে। পঞ্চগৌড় এবং পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এরূপ বৈমনস্য হইয়া পড়িয়াছে যে, গৃহস্থাশ্রমের অবস্থাতেই যে, কেবল এক ব্রাহ্মন অপরের সহিত বিভিন্ন, তাহা নহে ; পরন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরেও তাঁহাদিগের বৈমনস্য দূর হয় না, সে অবস্থাতেও তাঁহাদিগের পৃথক্ পানাহারে তাঁহাদিগের পৃথক্ প্রবৃত্তি থাকিয়া যায়। ফলতঃ সামাজিক অনুশাসনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতে করিতে আচারের সংশোধন, এই প্রকারে অশাস্ত্রীয় বৈমনস্য দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পারস্পরিক প্রেমের সহায়তা পরস্পরের গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অবিদ্যা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষার্থপ্রবৃত্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব এই শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে যে পর্য্যন্ত নিষ্কাম পুরুষার্থ সাধনের পুনঃ প্রবৃত্তি না হইবে, যে পর্য্যন্ত বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এবং আশ্রমগুরু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রীভগবৎ-কথিত গীতোপনিষদের কর্ম্মযোগ-বিজ্ঞানে পুনঃ প্রবৃত্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই অধঃপতিত আর্য্যজাতির পুনরুন্নতি এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হওয়া সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব।

অধুনা সাংসারিক ব্যক্তি প্রায়ই এরূপ বিচার করিয়া থাকেন যে, জ্ঞানবান্ হইলেই, সন্ন্যাস-আশ্রমধারী হইলেই, জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যখন কিছু তত্ত্বজ্ঞানের প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, তখন তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদিগের হস্তপদ সঞ্চালন করা অনুচিত! গৃহস্থগণ এইরূপ বিচারপূর্ব্বক ইহা নিশ্চয় করিয়া থাকেন যে, সাধুদিগের অপর কোন করণীয় নাই, লোকালয় এবং মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জন বনে গমন করিয়া একান্তসেবী হইয়া যাওয়াই তাঁহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য ; অথবা মূক, নিষ্ক্রিয়, পুরুষার্থহীন হইয়া জড়বৎ হইয়া থাকাই তাঁহাদিগের কার্য্য!!! অপর দিকে অধুনা নানারূপধারী সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবৃত্ত সাধুগণের মধ্যেও এরূপ প্রবাহ

দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের ভিক্ষু-আশ্রমধারী সাধকদিগের মধ্যে আলস্য, পুরুষার্থহীনতা, পরোপকারপ্রবৃত্তি ত্যাগ, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের অভাবাদি বৃত্তিসমূহ দেখা যাইতেছে!! ফলতঃ এখন বিচার করা যাউক যে, সন্ন্যাস অবস্থায় পুরুষার্থের সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য কি না। জ্ঞান দ্বারা অথবা হঠ দ্বারা সাধক সকল প্রকারে কর্ম্মত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতে পারে; কিন্তু কর্ম্মের পূর্ণরূপ ত্যাগ করিবার সামর্থ্যপ্রাপ্তি অসম্ভব। যদিও নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য, অথবা সাধন কর্ম্ম আদির ত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত শরীর বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত শারীরিক চেষ্টারূপ কর্ম্ম লাগিয়া থাকা অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ কদাপি হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ এই কারণেই গীতায় আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন যে, * কেহই বিনা কর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম্য সন্ন্যাস অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না, কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। কোন সময়ে একক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারে না; কারণ প্রকৃতিসম্ভূত গুণসমূহ জীবগণকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লয়। এই ভগবদ্বাক্যরূপ আপ্ত প্রমাণ দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে যে; জ্ঞানাবস্থাই হউক অথবা অজ্ঞানাবস্থাই হউক, কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ফলতঃ যখন কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে ত্যাগই হইতে পারে না, তখন কর্ম্মত্যাগ দ্বারা পূর্ণসিদ্ধিরূপ সন্ন্যাসাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বথা অযৌক্তিক।

এক্ষণে বিচার করা উচিত যে, তবে যথার্থ সন্ন্যাস অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীগীতার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, † যে পুরুষ

---

* ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

† অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

কর্ম্মফল লাভের ইচ্ছা না রাখিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনাপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্ম সাধন করেন, তিনি সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগ করিয়ে অথবা অক্রিয় হইলেই সন্ন্যাসিপদবাচ্য হইতে পারা যায় না; হে পাণ্ডব, যাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়, তাঁহাকেই কর্ম্মযোগী বলিয়া জানিও; কারণ যাঁহারা ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা কোন প্রকারে কর্ম্মযোগী হইতে পারেন না। ফলতঃ এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইল যে, নিষ্কাম পুরুষার্থের পূর্ণাবস্থাই সন্ন্যাসপদবাচ্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পুরুষ সকাম কর্ম্ম করিবার রীতি অভ্যাস করিয়া থাকে; গৃহস্থাশ্রমে সকাম কর্ম্মের সাধন করিয়া ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বানপ্রস্থ আশ্রমে পুনরায় নিবৃত্তির দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিষ্কাম হইবার অভ্যাস করে; এবং সন্ন্যাস আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া আপনার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে নিষ্কাম পুরুষার্থ সাধনপূর্ব্বক মোক্ষাধিকার লাভে সক্ষম হয়।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কর্ম্ম জড়শক্তি বিশিষ্ট;—ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কর্ম্ম মুক্তিপদ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে; এবং ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, মুক্তির সাক্ষাৎ কারণরূপ "আত্মজ্ঞানের" সহিত প্রাকৃতিক কর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত শরীর বিদ্যমান আছে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মরূপী পুরুষার্থের অবস্থিতিও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জ্ঞানদৃষ্টির রহস্য এই যে, অজ্ঞানী ব্যক্তি যে প্রকারে কর্ম্ম করে, মুক্ত জ্ঞানিগণ সেই কর্ম্ম অপর ভাবে করিয়া থাকেন। অজ্ঞানী কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বাসনার নাশ হওয়ায় জ্ঞানিগণ কোনপ্রকার কর্ম্ম হইতেই বন্ধন প্রাপ্ত হন না। ফলতঃ এই অনাদি এবং অনন্ত কর্ম্মপ্রবাহ, সাধনের অবস্থা এবং সিদ্ধাবস্থা উভয়ের মধ্যেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ আদেশ করিয়াছেন যে, * মুক্তি-ভূমিতে উপস্থিত হইবার ইচ্ছাকারী মুনিগণের নিমিত্ত সাধনরূপী কর্ম্মই কারণ, কিন্তু মুক্তি-ভূমির অধিকারীদিগের জন্য শমরূপ সমাধিই কারণ। যোগারূঢ় ব্যক্তি

---

* আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে এবং তাহার সাধনভূত কর্ম্মের আসক্তি রক্ষায় বিরত হন, তখন সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগী সেই সকল মহাপুরুষ যোগারূঢ়-সন্ন্যাস-পদ-বাচ্য হইয়া থাকেন। একমাত্র সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধিকারী সংপুরুষার্থ-সমূহই মুমুক্ষুগণকে ক্রমশঃ মুক্তি-ভূমিতে অগ্রসর করিতে করিতে শেষে জীবন্মুক্তি-পদ প্রদান করে। পুরুষার্থ ব্যতীত জীবগণের সর্ব্বদা অধঃপতন হইবার ভয় আছে, এই নিমিত্ত কেবল সাধনরূপী সৎপুরুষার্থই সাধকগণের নিমিত্ত হিতকারী।

যাহা হউক, কর্ম্মই ব্রহ্মসদ্ভাবরূপী সমাধিভূমিতে আরোহণেচ্ছু মুনিগণের নিমিত্ত একমাত্র সহায়ক, এবং যখন সাধক সিদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ সমতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইতে জীবন্মুক্ত হইয়া যান, তখন যদিও কর্ম্মের কোনও আবশ্যকতা না থাকায় পুরুষার্থ অবলম্বনীয় থাকে না, তথাপি সমতাবস্থা ব্যতীত সমাধিপ্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব হওয়ায় তখনও স্বাভাবিক পুরুষার্থ থাকা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং ক্রিয়াশীলা বলিয়া স্বভাবতঃ শরীর দ্বারা কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মাবস্থায়ও সমতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত মহাত্মা সমাধিস্থ থাকেন। সেই সময় জীবন্মুক্ত পুরুষগণ স্বভাবতঃ আপনাদিগের প্রাকৃতিক শক্তি অনুসারে সকল কার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নিঃসঙ্কল্প, সর্ব্বজীবহিতকারী পুরুষার্থের সহিত লিপ্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপ বাসনারহিত হওয়ায় তাঁহারা আপনার ইচ্ছায় কিছুই করেন না। অপিচ সমাধিস্থ জীবন্মুক্তগণ যাহা কিছু পরোপকার-ব্রত সাধন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ভগবৎ-আজ্ঞাধীন হইয়া জগৎকর্ত্তার ইঙ্গিতক্রমেই সম্পাদিত হয়। ইহাই জীবন্মুক্ত পুরুষগণের পুরুষার্থের গুপ্ত রহস্য। প্রকৃত পক্ষে ইহাই সন্ন্যাসাবস্থা।

এই নিমিত্ত ভগবান্ আজ্ঞা করিয়াছেন *—হে অর্জ্জুন! আমার সিদ্ধান্তানুসারে কর্ম্মযোগী, তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকাম কর্ম্মিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতএব তুমি কর্ম্মযোগী হও †। তোমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম

---

* তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

† নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

অবশ্যই করিতে হইবে ; কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা সর্ব্বথা হিত-কারী ; কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীর কদাপি রক্ষা হইবে না। হে ভারত! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানিগণ যে প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানী জীবন্মুক্তগণও জীবগণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য সেইরূপই কর্ম্ম করিয়া থাকেন *।

নিষ্কাম কর্ম্মে যে ব্যক্তি কর্ম্ম হয় না বলিয়া মনে করে, এবং বল-পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগে যে ব্যক্তি কর্ম্ম হয় বলিয়া অনুভব করে, সেই ব্যক্তি যথার্থ বুদ্ধিমান্, এবং পুরুষার্থকারী হইলেও সেই ব্যক্তি ব্রহ্মে যুক্ত অর্থাৎ জীব-মুক্ত †। এই প্রকারে গীতোপনিষৎ-কথিত ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, মনুষ্যগণের ক্রমোন্নতি করিবার নিমিত্ত যেপ্রকার কর্ম্ম করিবার একান্ত আবশ্যকতা আছে, সেইপ্রকার জীবন্মুক্ত অবস্থা অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমধিভাবের পূর্ণতায় স্বাভাবিকরূপে কর্ম্ম হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যে পর্য্যন্ত শূদ্র এবং বৈশ্যগণ দীর্ঘসূত্রতা এবং আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাসম্ভব কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে দেশের শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে তৎপর না হইবেন, সে পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির আধিভৌতিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ লোভ এবং প্রমাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগীতা-কথিত নিষ্কাম-ব্রত অভ্যাসে তৎপর না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিষ্কাম-ব্রত-পরায়ণ মনুষ্য উৎপন্ন করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থকে যথাসম্ভব নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ম্মযোগী বানপ্রস্থ-আশ্রমধারী পুরুষগণ যখন রাত্রিদিন লোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং সন্ন্যাস আশ্রমের একমাত্র অবলম্বন যে সময়ে শ্রীগীতোপ-নিষদের বিজ্ঞান হইয়া যাইবে, সেই সময় এই ঘোর রোগের শান্তি হইবে। সামাজিক অনুশাসনাভাবরূপী ক্ষয়রোগের সহিত স্বার্থপরতারূপী বীর্য্যভঙ্গরোগ

---

* সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

† কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ইতি গীতোপনিষদ্

উৎপন্ন হওয়ায় আর্য্যজাতির দশা এক্ষণে অত্যন্ত কঠিন এবং শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ প্রবল পুরুষার্থ অবলম্বনপূর্ব্বক যেমন যেমন সামাজিক-শক্তি-সঞ্চাররূপী ঔষধ প্রয়োগ এবং নিষ্কামব্রত-অভ্যাসরূপী অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে, সেই প্রকারই উক্ত রোগের শান্তি হইতে পারিবে। আর্য্যজাতিরূপী শরীরে সামাজিক অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা লুপ্তপ্রায় ক্ষাত্রতেজের ক্রমোন্নতি হইবে, এবং শ্রীগীতা-কথিত কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী ব্রহ্মতেজের আবির্ভাব হইবে। আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তানের পুনরুন্নতি দেখিয়া ঋষি, দেবতা এবং পিতৃগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং আর্য্য-জাতি তখন জগৎকল্যাণকারী হইয়া পরম শান্তির অধিকারী হইবে।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সুপথ্য-সেবন।

অনাদিকাল হইতে অনাদি কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়া এই অনাদি সৃষ্টি-লীলা প্রকট হইয়া রহিয়াছে। বেদোক্ত দর্শন-শাস্ত্রমাত্রেই একবাক্য হইয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, এই সৃষ্টিক্রিয়া প্রকট করিবার জন্য অনাদিপুরুষরূপী ঈশ্বর এবং অনাদিপ্রকৃতিরূপিণী মহামায়াই কারণ। প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হইতে সৃষ্টিক্রিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ স্বভাবতঃ নিঃসঙ্গ হওয়ায় সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে নির্লিপ্ত থাকেন এবং এই সংসারের স্থিতি প্রকৃতির দ্বারা সংসাধিত হয় বলিয়া এই সংসার প্রাকৃতিক নামে অভিহিত। *

যেপ্রকার বনের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ আছে, সেই প্রকার ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সম্বন্ধ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এই দেহরূপী পিণ্ডেরও আছে। কেবল এইমাত্র প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় যে, শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা নির্লিপ্ত থাকায় এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; কিন্তু জীব মায়ার সহিত লিপ্ত থাকেন বলিয়া আপনার কর্ম্মে বন্দী হইয়া পড়েন; এই কারণে তাঁহাকে এই পিণ্ডের ভোগসমূহের ভোক্তা বলা যায়। যেপ্রকার ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক শক্তিসমূহ প্রকট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়া সমষ্টিরূপে করিয়া থাকে, সেইপ্রকার এই পিণ্ডরূপী জীবশরীরে প্রকৃতি এবং পুরুষ-শক্তির সংযোগ হইতে জীবসৃষ্টি হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিক্রিয়ায় ঈশ্বরের ঈক্ষণ-জনিত প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে। উক্ত রীতি অনুসারে সংসারে স্ত্রীপুরুষসংযোগ দ্বারা রমণীর গর্ভে নূতন সৃষ্টির উৎপত্তি হয়। সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-ক্রিয়ার সহিত, ব্যষ্টিরূপী জীব-

---

* প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

সৃষ্টির সম্বন্ধ মিলাইলে পর স্ত্রীজাতির অধ্যাত্ম সম্বন্ধের রহস্য প্রকাশিত হয় *। বেদসমূহের মন্ত্র সংহিতা হইতে লইয়া শাস্ত্রসমূহ এবং পুরাণাদিতে সৃষ্টি বিষয়ে এই ভাব সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে।

বৈদিক দর্শনসমূহ অনুসারে প্রকৃতিপুরুষ-বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পুরুষ চেতন, নিঃসঙ্গ এবং জ্ঞানময়। কিন্তু মূলপ্রকৃতি জড়া, সঙ্গশীলা, পরিণামিনী এবং পরাধীনা। যদিও পুরুষের দৃষ্টি ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে না, কিন্তু পুরুষ সদা সৃষ্টি হইতে অতীত, স্বাধীন এবং জ্ঞানযুক্ত থাকেন। পরন্তু সৃষ্টিক্রিয়া পুরুষের সঙ্গ দ্বারা মূলপ্রকৃতিই করিয়া থাকেন এবং পুরুষের সঙ্গ ব্যতীত প্রকৃতি কিছুই করিতে পারেন না; বলিতে কি, পুরুষের দৃষ্টি-ব্যতিক্রম ঘটিলেই প্রকৃতির লয় হইয়া যায়। সেই ঐশ্বরিক সৃষ্টি-নিয়মানু-সারে ব্যস্তরূপী নর এবং নারী-দেহেও যথাবৎ ক্রিয়া হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যদি সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষ এবং সৃষ্টিকর্ত্রী মূলপ্রকৃতির সহিত নর এবং নারী-দেহের সমষ্টি এবং ব্যষ্টি সম্বন্ধ বিজ্ঞানসিদ্ধ হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই আদি নিয়মানুসারে নারীশরীরে শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টাসমূহ নিজ পতির সম্পূর্ণ অধীন থাকা স্বভাবানুকূল †।

নিজ প্রকৃতির অনুকূল সাধন করিলে, জীবের সফলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূল কার্য্য করিলে কার্য্যের গতিরোধ হইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত। নদীতে স্রোতের অনুকূলগামী নৌকা ঠিক চলিতে পারে; কিন্তু

---

* স তপস্তপ্ত্বা মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িং চ প্রাণঞ্চ অসৃজৎ। ইতি শ্রুতি।
"অগ্নিসোমাত্মকং জগৎ।" ইতি স্মৃতি।
বিন্দুঃ শিবো রজঃশক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডঃ পিণ্ড উচ্যতে॥ (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য)

† আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টেনৈষামাত্মার্থ আরম্ভঃ।
প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ॥
প্রকৃতিনিবন্ধনা চেন্ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্।
ত্রিগুণাচেতনত্বাদিদ্বয়োঃ॥ (সাংখ্যদর্শন)

তাহাকে নদীস্রোতের বিরুদ্ধে লইয়া গেলে, প্রথমে অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে; এবং দ্বিতীয়তঃ যদি কোন বাত্যাদি কারণ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে যে প্রকৃতি অবলম্বন-পূর্ব্বক নর অথবা নারী-শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রকৃতি-প্রবাহের অনুকূল সাধন করিলে, সেই শরীরে শীঘ্রই সফলতা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ নারীশরীরে যে ধর্ম্মাদি সম্বন্ধ আছে, সেই ধর্ম্মের অনুকূল নারীশরীর চলিলে পর, সেই শরীরের সাধনে সফলতা প্রাপ্ত হইবে। অন্যথা অধর্ম্ম এবং বিপত্তি দুইই হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই *।

যেপ্রকার সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতি ক্ষেত্র এবং পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, সেইপ্রকার ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে জীবসৃষ্টির মধ্যে নরদেহ বীজরূপ এবং নারীদেহ ক্ষেত্র-রূপ †। এবং যে প্রকারে ঐশ্বরিক সৃষ্টিতে পুরুষ কেবল দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিতি করেন, কিন্তু প্রকৃতিই সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রধানা, ‡ সেই নিয়মানুসারে জীবসৃষ্টিতে নরদেহ অপ্রধান এবং নারীদেহ প্রধান। সাধারণ যুক্তির দ্বারাই এই বৈজ্ঞানিক বিচারের সিদ্ধান্ত হইতে পারে। প্রথম বিচারের যোগ্য বিষয় এই যে, সন্তানের উৎপত্তিকালে যদি পুরুষ বীর্য্য প্রদানপূর্ব্বক পর মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে জীবশরীরের উৎপত্তি ও রক্ষার বিষয়ে কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। পরন্তু গর্ভাবস্থা এবং সন্তানপালন-সময় পর্য্যন্ত নারীশরীর বিদ্যমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মাতার কৃপা ব্যতীত সন্তানের উৎপত্তি এবং তাহার লালনপালন হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় বিচার করিবার যোগ্য বিষয় এই যে, যদি কোন মনুষ্যের পঁচিশটী পত্নী থাকে এবং সেই সকল পত্নী পতিব্রতা, বুদ্ধিমতী এবং ঋতু-অনুগামিনী হয়, তবে সেই গৃহস্থের ধর্ম্মরক্ষা এবং সৃষ্টিনিয়ম পালন করিবার

---

* শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

† ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

‡ কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ঋতুগমনের আদেশ আছে এবং যাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারেও স্বভাবসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মের আদেশানুসারে যদি সেই সকল পতিব্রতা এবং জিতেন্দ্রিয়া রমণীরা নিজ পতির সেবা করিতে থাকেন, তবে নিয়মিত সন্তানোৎপত্তিতে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। বরং মাতার ধর্ম্মপালন এবং ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অতি ধার্ম্মিক তেজস্বী এবং সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি একটী স্ত্রী দুইটী পুরুষের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া সৃষ্টির নিয়ম পালন করিতে ইচ্ছা করে, তবে কখনই সৃষ্টি-ধর্ম্ম পালন করিতে পারে না। অর্থাৎ অধিক সংখ্যার ত কথাই নাই, এক ক্ষেত্রে কখনই দুইটী বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। ফলতঃ জীবসৃষ্টি-ক্রিয়ার মধ্যে নারীই প্রধান *। তৃতীয় বিচারযোগ্য বিষয় এই যে, স্ত্রীর ক্ষেত্র হওয়ায়, মনুষ্যসমাজে পুরুষের সৃষ্টি ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় তত অনিষ্ট হয় না, যত নারী নিজ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়। অর্থাৎ পুরুষ জাতির দুষ্কর্ম্মের প্রভাব কেবল তাহার উপর পতিত হয়। কিন্তু নারী জাতির ব্যভিচার দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে, এবং কুল ও জাতি অপবিত্র হইয়া যায়। ফলতঃ নারীর শরীর সাবধানে রক্ষা না করিলে, তাহার ব্যভিচার দ্বারা সমস্ত কুল এবং সমস্ত জাতিকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই প্রকারে যতই প্রকৃতি-রাজ্যসম্বন্ধীয় সূক্ষ্মভাবের প্রতি লক্ষ্য করা হইবে, ততই সৃষ্টিকার্য্যে নারীর প্রাধান্য এবং অপূর্ব্ব বিশেষত্ব জ্ঞাত হইবে। এইরূপ নানাপ্রকার কারণে চিন্তাশীল মনুষ্যগণ স্বতঃই স্বীকার করিবেন যে, মনুষ্যসমাজে পুরুষ এবং রমণী উভয়েরই কখন সমানাধিকার থাকিতে পারে না। সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত রহস্য প্রকাশ করা গেল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ বিজ্ঞানের অবলম্বনে নারীধর্ম্ম নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইবে যে, মনুষ্যসমাজের সৃষ্টিমধ্যে যখন নারীশরীরই সর্ব্বপ্রধান, তখন সেই

---

* যতো বীজাঙ্কুরোৎপত্তৌ তরূণাং পুষ্টিবর্দ্ধনে।
কারণং কেবলা ভূমির্নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥
অতো জগতি নাস্ত্যস্তি মাতুর্গুরুতরো জনঃ।
প্রাধান্যং প্রকৃতেঃ সিদ্ধং সৃষ্টিকার্য্যপ্রসারণে ॥ (তন্ত্র)

নারীশরীরের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা এবং উহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের যে প্রধান কর্ত্তব্য, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মের লক্ষণ বর্ণন করিবার সময় পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ বলিয়াছেন, যাহার দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি এবং মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ যাহার সাহায্যে জীবের ক্রমোন্নতি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। তমোগুণই জীবের নাশের কারণ। কারণ তমোগুণ বৃদ্ধির দ্বারা জীব জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। রজোগুণ দ্বারা ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া, রজোগুণ হইতে চেতন ভাবের আধিক্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণের বৃদ্ধি হিতকরী। কিন্তু সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। অতএব সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানরূপী ঐশ্বরিক ভাবের প্রকটতা হইয়া থাকে; এই কারণে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলেই ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সমস্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুরুষার্থ নির্ণীত হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে জ্ঞানময় সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ক্রিয়া কোনওরূপ বাধা প্রদান না করে, বরং জীবের আত্মোন্নতি-কর্ম্মপ্রবাহকে সরল করিয়া দেয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তানুসারে জগতের সকল পদার্থ এবং জীবের সকল ক্রিয়াই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ভাব দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত আছে। অবস্থাভেদে জীব-কল্যাণকারী ধর্ম্মের এবং তদ্বিরোধী অধর্ম্মের তারতম্য হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল স্থানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত কোন স্থান অথবা বস্তু থাকিতে পারে না। * দৃষ্টান্তস্থলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটী ক্ষুদ্র কীট-হত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া, একটী ব্রাহ্মণ-হত্যা পর্য্যন্ত অধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উভয় অবস্থার গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে। সেইপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে, একটী পশুর প্রাণরক্ষা এবং একজন রাজা বা ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ধর্ম্মত্বরূপে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম আছে। নদীগর্ভের যে স্থান নিম্ন, সেই স্থানেই জলের গভী-

---

* ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥ (মহর্ষি বেদব্যাস)

রতা থাকিবে ; এবং যে স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ, সেই স্থানে জলের গভীরতার অভাব হইবে ; কিন্তু নদীর প্রবাহ সর্ব্বত্রই সমান থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইপ্রকার ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ভিত্তির উপর অবস্থিত থাকিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও কোনস্থলে ধর্ম্মের স্থূল রূপের সহিত উহার সূক্ষ্মরূপ মিলাইতে মিলাইতে কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু কখন কখন উভয়কে এক অবস্থাপন্ন অনুমান করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম বিজ্ঞানযুক্ত দৃষ্টি দ্বারা দেখিলে আপনাদিগের শাস্ত্রের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কন্যাবিবাহের কাল-নির্ণয়ের সময় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ অষ্টমবর্ষ হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত সময় অবধারিত করিয়াছেন।* কোন কোন গ্রন্থে কিছু মতান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ এবং বিস্তৃত। ইহা প্রথমেই সিদ্ধ হইয়াছে যে, সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে নারীদেহই প্রধান ; এই কারণে তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা আবশ্যক। বিচার করিতে হইবে যে, নারীদেহে অপবিত্রতা এবং চঞ্চলতা প্রভৃতির প্রকাশ হওয়া কোন্ সময় হইতে সম্ভব। বুদ্ধিমান্ মাত্রেই যখন বালক এবং বালিকার প্রকৃতির প্রতি চিন্তা প্রয়োগ করিবেন, তখন তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, বালকের মধ্যে পুরুষ ভাবের উদয় সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ বর্ষের নিম্নে হয় না, কিন্তু বালিকার প্রকৃতি মধ্যে নারীভাবের উদয় অনেক শীঘ্রই হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বালিকার প্রাকৃতিক পূর্ণতা ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বর্ষের নিম্নেই প্রাপ্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ; কিন্তু বিচারশীল মনুষ্যগণ স্থিরবুদ্ধি হইয়া বালিকা-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই বুঝিতে পারিবেন যে, অষ্টমবর্ষ অথবা নবমবর্ষ সময়েই বালিকা-শরীরে নারীগত ভাবের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হয়। যখন বালক এবং বালিকা এই উভয়ের শরীরের প্রকৃতি দেখা যায়, তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অষ্টম অথবা নবমবর্ষীয় বালক পরমহংসবৎ নির্দ্বন্দ্বই থাকে ; কিন্তু অষ্টম অথবা নবমবর্ষীয়া কন্যা আপনি আপনার দেহকে নারী-শরীর জ্ঞান করিয়া লজ্জা, শীলতা, সঙ্কোচ প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া যায়। ফলতঃ যে সময় হইতে নারীশরীরে নারীগত চঞ্চলতার উদয় হওয়া সম্ভব, সেই সময় তাহার বিবাহ দিলে সেই নারী-

---

* অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ মহর্ষি পরাশর।

শরীরের পূর্ণ শুদ্ধতা স্থাপন করিবার উপায় হইতে পারে। অজ্ঞানান্ধ জীবের নিমিত্ত সংস্কারই বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ, অতএব আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল সংস্কার-সমূহকে এতই পরমাবশ্যকীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণে গৃহস্থগণের নিমিত্ত দশবিধ সংস্কারবিধি এরূপ দৃঢ়তার সহিত নির্ণীত করা হইয়াছে। মনুষ্য-চিত্তের উপর সংস্কারের আধিপত্য অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। যেরূপ আলবাল বন্ধন দ্বারা জলস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ সেই জলস্রোত সেই সময় আলবালের বাহিরে প্রবাহিত না হইয়া সরলতার সহিত এক স্থান হইতে অপরস্থানে প্রবাহিত হয়, ঐ নিয়মানুসারে সংস্কার দ্বারা সীমাবদ্ধ চিত্ত পুনরায় নানাদিকে গমন করিতে পারে না এবং সেই দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারানুসারে আপনার স্বধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হয়। অপিচ যে সময়ে নারীদেহে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহার পূর্ব্বে হইতে যদি বালিকার অন্তঃকরণকে বিবাহসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিয়া সীমাবদ্ধ করা যায়, তবে পুনরায় নারীশরীরে অপবিত্রতার দোষ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

স্থূল বিচারে মতভেদ থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কারণ বিজ্ঞানের সূক্ষ্মগতি একই হইলেও, যখন উহার স্থূল প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন উহার ভাব নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। সূক্ষ্মবিজ্ঞানে যেপ্রকার বৈষয়িক স্থূলভাব-সমূহের ন্যূনতা হইয়া যায়, সেই রীতি অনুসারে স্থূল বিষয়সমূহের বিচারে সূক্ষ্ম-বিজ্ঞানের ন্যূনতা হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। উদাহরণস্থলে বলা যায় যে, জন্মপত্রিকা দেখিয়া বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্‌গণ সকলেই একমত হইতে পারেন, কিন্তু করকোষ্ঠী দেখিয়া সূক্ষ্মগণনা সম্বন্ধে অনেকেরই মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে ধর্ম্মের আদি বিজ্ঞান নির্ণীত করিবার সময় ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মতের মধ্যে কিছুই বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহাদিগের স্থূল ধর্ম্মানুশাসনমধ্যে কখনও কখনও মতের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। নারীর সাধারণ ধর্ম্মনির্ণয় করিবার সময় সকল আচার্য্য একমত হইয়াছেন। রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে কন্যাকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু রজস্বলা হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিবাহকাল নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ফলতঃ নারীবিবাহ-কালের বিষয়ে স্মৃতিকারগণ যদি একমত হইতে না পারেন, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের মতের পার্থক্য কিছু থাকিলেও অষ্টবর্ষের ন্যূন সময়ে

বিবাহ দিবার জন্য কেহই কোনপ্রকার আদেশ করেন নাই। অতএব যদি নারী-শরীরের পূর্ণ শুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। এই নিমিত্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ আপনাদিগের দূরদর্শিতা দ্বারা এইরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপবিত্রকর এবং নারীধর্ম্মরক্ষাকারী আজ্ঞার প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ কন্যাবিবাহ-কালের নিমিত্ত * অষ্ট বর্ষ সর্ব্বোত্তম, নব বর্ষ মধ্যম এবং দশ বর্ষ সাধারণ কাল বিবেচিত হইয়াছে। উহার পরবর্ত্তী কাল ধর্ম্মবিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে। যদিও এইরূপ শাস্ত্রীয় আজ্ঞার দ্বারা ৮ম হইতে ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ-কাল নির্ণীত হইয়াছে, এবং এ নিয়ম নির্ণয় সম্বন্ধেও আচার্য্যদিগের মতভেদ আছে, কিন্তু ইহার দ্বারা যেন কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত না করেন যে, পূর্ণবয়স্কা হইবার পূর্ব্বে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ স্ত্রী-সঙ্গ করিবার বিধান করিয়াছেন। এই আজ্ঞার কারণ অতিশয় দূরদর্শিতাপূর্ণ। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ মোহময়ী এবং চঞ্চলা; উহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ থাকা তখনই সম্ভব, যখন তাহার অন্তঃকরণ চঞ্চলতা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিবাহসংস্কার দ্বারা পতি-কেন্দ্র-স্থাপন-পূর্ব্বক সীমাবদ্ধ হইয়া যায়, ঐ সময় তাহার অন্তঃকরণ পুনরায় চঞ্চল হইলেও তাহাতে অন্য অধর্ম্মসংস্কার পড়িতে পারে না।

পূর্ব্বকথিত সকল বিচার হইতে ইহা নির্ণীত হইল যে, যখন সমষ্টি ব্যষ্টি বিজ্ঞান হইতে পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধ ঈশ্বর এবং মহামায়া—মূলপ্রকৃতির আদর্শে স্থিরীকৃত হয়, তখন এই সিদ্ধান্ত হইল যে, নারীর বিবাহ হইলেই সে সর্ব্বথা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত পতির অধীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিবিজ্ঞানানুসারে নারী সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা হওয়ায় সতীত্ব রক্ষাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, লোক-অকীর্ত্তিকর এবং পাপজনক বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ হওয়া ত পূর্ব্বোল্লিখিত বিজ্ঞানানুসারে সম্ভবই নহে; এমন কি, নারী মনে মনেও পরপুরুষের সহিত কলঙ্কিত হইলে দূষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের কোন কোন পুরাণাদি শাস্ত্রে কোন কোন রমণীর পত্যন্তর গ্রহণের উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল উদাহরণ গৌণ এবং নিন্দনীয় পক্ষে বুঝিতে হইবে। উহা আদর্শ ধর্ম্ম নহে। এখনও যে রমণী আদর্শধর্ম্ম পালন করিতে একেবারেই অক্ষম হন,

---

* গৌরীং দদদ্ বিষ্ণুলোকং দদদ্ ব্রাহ্ম রোহিণীস্তম্।
কন্যাং দদদ্ স্বর্গলোকং রৌরবন্ত রজস্বলাম্॥ মহর্ষি বেদব্যাস।

তিনি অপেক্ষাকৃত অধোগতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য অন্য গৌণ ধর্ম্মের আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু সমাজমধ্যে তিনি অবশ্যই নিন্দনীয় হইবেন। এক নারীর সহিত দুই পতির সম্বন্ধ আর্য্যজাতির মধ্যে হইতেই পারে না, এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত অন্য বাহ্যিক যুক্তি দ্বারাও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। প্রধান যুক্তি এই যে, সনাতন ধর্ম্মানুসারে কন্যাকে দান করাই হইয়া থাকে। দত্তবস্তুর উপর পতিরই পূর্ণ স্বত্ব থাকে। বিধবাবিবাহের নাম মাত্রেই আর্য্যজাতিভাবকে কলঙ্কিত করিয়া থাকে। কারণ নারী-সমাজে, সতীত্ব-রক্ষার বিরুদ্ধ কোনও সংস্কার প্রচারিত হইলে, তাহার দ্বারা স্ত্রীজাতির হৃদয় হইতে পরম পবিত্র, মনুষ্য-সমাজ-মঙ্গলকর সতীধর্ম্মের আদর্শ—সংস্কারের বিলোপ সাধনের সম্ভাবনা আছে। এই সনাতন ধর্ম্মের এরূপ পবিত্র অনুশাসন থাকিবার জন্যই আর্য্য জাতির এরূপ অধঃপতিত দশাতেও আমরা আমাদিগের সমাজমধ্যে কখনও কখনও আদর্শ সতীগণের দর্শন লাভ করিয়া থাকি। জগৎ-পবিত্রকারী এই পবিত্র দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন জাতির রমণীমধ্যে দেখা যায় না।

অদূরদর্শী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা মোহান্ধ ব্যক্তিরা এক্ষণে যে নারীদিগকে স্বাধীনতা প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে সতীত্বধর্ম্মবর্জ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক প্রকার ধর্ম্মভ্রষ্টকারী উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান-পূর্ব্বক আর্য্যনারীদিগের পবিত্রতা রক্ষায় সযত্ন হওয়া এক্ষণে বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। যাহাতে আর্য্যনারীদিগের মধ্য হইতে ত্রিলোকপবিত্রকর সতীত্বধর্ম্মের আদর্শ বিলুপ্ত হইতে না পারে, এরূপ উপায় সর্ব্বদা করণীয়। অদূরদর্শীদিগের দ্বারা প্রাচারিত সতী-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সংস্কারসমূহের প্রভাব নারীজাতিমধ্যে যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, এরূপ ধর্ম্মানুকূল উত্তম শিক্ষা কন্যাদিগকে প্রথম অবস্থা হইতেই দেওয়া উচিত। কন্যাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মভাবপূর্ণ শিক্ষার রীতি প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইত, সেইপ্রকার ধর্ম্মভাবপূর্ণ স্ত্রীশিক্ষার পুনঃপ্রচার হইলে অবশ্যই ক্ষেত্রদোষ-সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নারীগণ সমাজের প্রধান অঙ্গ, তাঁহাদিগের শুদ্ধি হইতে সমাজের রোগ সকল বিনষ্ট হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কালে "পর্দ্দার" রীতি ছিল না, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদান করা

সর্ব্বথা মহর্ষিগণের সম্মতি-বিরুদ্ধ। * রমণীদিগকে পরাধীন রাখিয়া তাঁহাদের উন্নতি চেষ্টা করাই সনাতন ধর্ম্ম। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সমাজে সমান অধিকার কখনও থাকিতে পারে না। আপন আপন ধর্ম্মানুসারে স্ত্রী এবং পুরুষের অধিকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে বলিয়াই আর্য্যজাতিভাবের পুষ্টি হইতে পারে। নারীজাতির পবিত্রতা বৃদ্ধি এবং তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি যতই সংসাধিত হইবে, বর্ত্তমান সামাজিক পীড়াও সেই পরিমাণে প্রশমিত হইবে, সামাজিক ঔষধের ফলও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে এবং কামজ সন্ততির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মজ সন্ততি উৎপন্ন হইবে ; চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের শুদ্ধি হইতে পারিবে এবং তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং তেজস্বী ক্ষত্রিয় বর্ণ পুনরায় ভারতবর্ষে পরিদৃশ্যমান হইয়া আর্য্যজাতির কল্যাণসাধন করিতে পারিবে।

নারীজাতিকে সতীত্বধর্ম্মরক্ষার অনুকূল সংশিক্ষা দিলে এবং পুরুষদিগকে প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন করাইতে করাইতে ধর্ম্মানুকূল সংশিক্ষা দান করিলে, এ সময়ের সামাজিক প্রবল রোগে সুপথ্য প্রয়োগ হইতে পারে। যদি স্ত্রী এবং পুরুষোপযোগী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংশিক্ষার প্রচার না করা হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধ ফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপ এবং আমেরিকায় ধর্ম্মানুকূল সংশিক্ষার অভাব আছে বলিয়াই তথাকার রমণীগণ দিন দিন পুরুষভাবাপন্না এবং বিপথ-গামিনী হইয়া পড়িতেছেন। এবং তথাকার শিক্ষিত সমাজে য়্যানার্কিষ্ট (anarchist) এবং নিহিলিষ্ট (nihilist) আদি রাজবিদ্রোহী লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। যদি ভারতবর্ষে যথাদেশকালপাত্র এবং ধর্ম্মানুকূল স্ত্রীশিক্ষা এবং পুরুষশিক্ষার প্রচার না হয় তাহা হইলে পাশ্চাত্য-শিক্ষাজনিত কুফল দ্বারা ভারতের প্রজারও এইরূপ শঙ্কাপ্রদ দশা হইবে। এবং তখন সামাজিক রোগের বৃদ্ধি হইলে চিকিৎসা করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতরাং যথা-যথভাবে বিদ্যাপ্রচার ব্যতীত এই ঘোর রোগের শান্তি হওয়া অসম্ভব। বিদ্যাই সকলপ্রকার প্রকৃত সুখের মূল। যাহার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয়, তাহাকে বিদ্যা

* পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ (ইতি মহর্ষি মনু)

বর্ত্তমান কালের নব্যশিক্ষিত বিলাসিতাপ্রিয় যুবকগণ বলেন, ঋষিগণ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণপূর্ব্বক তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। যুবকদিগের এই বিচার প্রমাদ-মূলক। কারণ যে পদার্থ যাহার অধিকপ্রিয়, তাহা রক্ষা করিতে সে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে।

বলা যায়। বিদ্যাই জ্ঞানের জননী। সাধকের মধ্যে বিদ্যার যতই আধিক্য হইয়া থাকে, তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টি ততই বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিদ্যাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের মধ্যে ভ্রম দূর হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি ব্যক্ত হয় না। পূজ্যপাদ ঋষিগণ বিদ্যার এই স্বরূপ বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পদার্থসম্বন্ধীয় বিচার এবং সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়াকেই লোকে বিদ্যা নামে অভিহিত করে। এই নিমিত্ত যতপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা-প্রণালী আজকাল ভারতে প্রচলিত আছে, সেই সকলের মধ্যে বড় বড় ত্রুটীও পরিলক্ষিত হয়। কি সংস্কৃতবিদ্যার্থিগণ, কি অন্যভাষাবিদ্যার্থিগণ সকলেই যথাবৎ শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ বিদ্যার লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যে বিরুদ্ধ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া তাঁহারা সদাচার এবং ধর্ম্মের বিপরীত মার্গে গমন করিতেছেন দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষমধ্যে যতপ্রকার শিক্ষা-প্রণালী আজকাল প্রচলিত আছে, সে সকলই অসম্পূর্ণ, এবং সদোষ। সেই সকল প্রণালীর দ্বারা আর্য্যজাতি পূর্ণরীতিক্রমে লাভবান্ হইতে পারিতেছেন না। এ সময়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির তিনটী উপায় দেখা যায়। যথা—প্রথম প্রাচীন রীতি-ক্রমে সংস্কৃতবিদ্যাভ্যাসের রীতি, দ্বিতীয় নবীন ইউনিভার্সিটীসমূহের প্রথানুসারে সংস্কৃতবিদ্যাভ্যাসের রীতি, এবং তৃতীয় ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সহায়তায় জ্ঞানার্জ্জনের রীতি। বলা বাহুল্য, তিনটী শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কোনটীতেই ধর্ম্মশিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত নাই। ফলতঃ মহর্ষিদিগের সময়ে যে শিক্ষাপ্রণালী ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীসমূহের ভেদ পড়িয়া গিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বিদ্যালাভের নিমিত্ত আমাদিগের এক্ষণে মাতৃভাষাই প্রধানাবলম্বন। কিন্তু উহার সম্পূর্ণ সাহায্য আমরা পাইতেছি না। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই ভাষা আজি পর্য্যন্তও অসম্পূর্ণ আছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী ভাষারই অনুকরণে মাতৃভাষার অতি নিম্ন শ্রেণীর সামান্য শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাজেই সেই শিক্ষা দ্বারা এক্ষণে ভারতবাসীদিগের সম্পূর্ণ কল্যাণের আশা নাই। কারণ, যখন ঐ সকল মাতৃভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় না, তখন ফল যে অসম্পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইংরাজীবিদ্যাশিক্ষার দ্বারা যদিও ভারতবাসীর

অনেক লাভ হইয়াছে, এবং লৌকিক শিক্ষা সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কেবল ইংরাজী ভাষার উন্নতির দ্বারা ভারতবাসীর সম্পূর্ণ কল্যাণের আশা নাই। যদিও সকলপ্রকার পদার্থবিদ্যার জ্ঞান এই ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌গণের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি একেবারেই না থাকায়, এই ভাষার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির আশা কিছুমাত্র নাই। বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষা বৈদেশিক হওয়ায় এই ভাষায় পূর্ণাধিকার লাভ করিবার জন্য প্রথমে অনেক সময়ের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এবং সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীরও ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করা কথনই সম্ভবপর নহে। এই কারণে ইংরাজী ভাষার অনেক গুণ থাকিলেও এই ভাষা শিক্ষার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনাও নাই, এবং সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীর নিমিত্তও এই ভাষা শিক্ষা উপকারী হইতে পারে না।

প্রাচীন কালে নানা কারণে সংস্কৃত বিদ্যার প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষার নিমিত্ত অধিক সময় প্রদত্ত হইত, সেইরূপ নিয়মক্রমে আজিও প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যা চলিয়া আসিতেছে। উদাহরণস্থলে বুঝিতে পারা যায় যে, কাশী প্রভৃতি স্থলের বিদ্যালয়সমূহে আজিও যে প্রাচীন রীতিক্রমে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অভ্যাসের রীতি প্রচলিত আছে, অথবা নবদ্বীপে যে নবীন ন্যায়দর্শন পাঠ করাইবার রীতি প্রচলিত আছে, সেই সকল পঠনপ্রণালীর মধ্যে যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গেলেও ঐ সকল বিদ্যার্থীর সর্ব্বদেশীয় বিদ্যার যোগ্যতা লাভ হয় না, এবং সেই শিক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতিও লাভ হয় না। বর্ত্তমান সংস্কৃত-বিদ্যা-শিক্ষা প্রণালীর প্রতি যতই সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করা যায়, ততই বুঝিতে পারা যায় যে, উহার সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যার্থীদের প্রথমাবস্থায় ঋষিপ্রণীত কাব্য সকল না পড়াইয়া লৌকিক কাব্য সকল পড়ান হইতেছে বলিয়া উহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে বাধা হইয়া থাকে। সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের মধ্যে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, দার্শনিক বিদ্যার্থিগণ সপ্তদর্শনের সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন না এবং কেবল দুই একটি দর্শনসিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া পড়েন। অন্যদেশীয় দর্শনের মত আমাদের দর্শনশাস্ত্র কাল্পনিক নহে; উহা অনাদিসিদ্ধ, অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পূর্ণ। বিশেষতঃ সকল দর্শনসিদ্ধান্তগুলি যথাক্রমে হৃদয়ঙ্গম

হইলে তবে তত্ত্বজ্ঞানের সূত্রপাত হইতে পারে। কেবল দুই একটি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে বুদ্ধির সেরূপ বিকাশ হইতে পারে না। এইরূপে যত চিন্তা করা যায়, ততই শিক্ষাপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। আজকাল যে "ইউনিভার্সিটী"র রীতি অনুসারে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের নবীন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, উহার দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যার যদিও কিছু সাধারণ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে কি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ের জ্ঞান, অথবা কি আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রাপ্তি কিছুই লাভ হয় না। প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা পূর্ণ, কিন্তু উহা এক-দেশীয় হওয়ায়, এবং নবীন সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তৃত, কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকায়, বর্ত্তমান উভয়প্রকার শিক্ষাপ্রণালীই ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রদ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উভয়প্রকার রীত্যনুসারেই সংস্কৃত শিক্ষায় বর্ত্তমান দেশকালপাত্র সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাপ্তির কোন রীতিই রক্ষিত হয় নাই। এই কারণে প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতার অভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ আবশ্যকীয় লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার অভাবে, আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষিতগণ প্রায় দেশকাল-পাত্রের বিষয়ে এবং ধর্ম্মরহস্য নির্ণয় সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষিতদিগের নিকট স্বতঃই নিরুত্তর হইয়া থাকেন।

আর্যসন্তানদিগের মধ্যে আজকাল যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা আর্য্যদিগের মধ্যে দিন দিন স্বার্থপরতা বৃদ্ধি হইতেছে, অর্থাৎ আর্য্য-সন্তানদিগের দৃষ্টি শারীরিক ব্যাপারের প্রতিই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং তাহাতেই ধর্ম্মভাব ও নিষ্কাম কর্ত্তব্য বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে পর্য্যন্ত সদাচার এবং ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রচার তাহাদিগের মধ্যে না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কদাপি আর্য্যজাতির উন্নতি হইবার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে আজকাল বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেপ্রকার অভ্যাস দ্বারা তাহারা কখনও সদাচার এবং ধর্ম্ম শিক্ষায় আপনা-আপনি উন্নত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ আজকাল কেবল মুখেই যাহা কিছু "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" বলিবার রীতি প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। এরূপ মৌখিক ধর্ম্ম হইতে ভারতবর্ষের কল্যাণ হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। যত দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সাধনের প্রতি ভারতবাসীদিগের রুচি বৃদ্ধি না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা কোন ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ এবং উহার স্ফূর্ত্তি ধর্ম্মানুকূল হইয়া আপনাকে

স্বাধীন এবং সফলকাম করিয়া থাকে, যে শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা মনুষ্যসমূহের মধ্যে স্বার্থপরতা বিনষ্ট হইয়া স্বজাতি-প্রেম এবং জগৎকল্যাণ-বুদ্ধির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার শিক্ষাকেই যথার্থ শিক্ষা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-কথিত বিচারসমূহের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইল যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অসম্পূর্ণ। অতএব প্রকৃত বিদ্যা প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিকালের আদর্শে কোন নূতন পঠনপ্রণালীর আবিষ্কার করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শ্রীমহামণ্ডলের বিদ্যাপ্রচার বিভাগ সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, এই কার্য্যবিভাগের স্বাতন্ত্র্য প্রদান ব্যতীত ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি হইবে না। যে পর্য্যন্ত পূর্ণ রীতি অনুসারে নূতন পঠনপ্রণালী যথাযথরূপে আবিষ্কৃত না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত ইহাই লক্ষ্য রাখা হউক যে, বর্ত্তমান দেশকালানুসারে বিদ্যা প্রাপ্তির উপায় নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বিচার থাকে। বিদ্যার্থিগণ কিরূপে যথার্থ বিদ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিরূপে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অধিকারী হইতে পারে, কিরূপে তাহারা দেশকালজ্ঞ এবং স্বদেশহিতৈষী হইতে পারে, কিরূপে তাহারা আপন স্বার্থের সঙ্কোচ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উন্নতি করণে সমর্থ হয়, এবং কিরূপে তাহারা আপনাদিগের অভাবসমূহের ন্যূনতা করিতে করিতে জ্ঞানবান্ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম হইতে পারে, ইহার অনুসন্ধান সতত করা হউক। এতদ্ব্যতীত যে সুগম উপায় স্থির হয়, তদনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃত বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করা হউক।

কেবল পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করিলে এবং মন ও শরীর পবিত্র রাখিতে পারিলেই নারীগণ কল্যাণমার্গ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেবল পতিপরায়ণা সতী গৃহিণী প্রস্তুত করাই স্ত্রী-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু পুরুষদিগের শিক্ষা দিবার সময় বহুল চিন্তা এবং অনেক বিস্তৃত প্রণালীর অনুসরণ আবশ্যক। তথাপি সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রথম অবস্থায় তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আশ্রমসমূহের অধিকারী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত করা উচিত। মন, বায়ু এবং বীর্য্য এই তিনই কার্য্য কারণ সম্বন্ধে একই পদার্থ। যেপ্রকার স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের মধ্যে একটী অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেইপ্রকার বীর্য্য, বায়ু এবং মন এই তিনই পরস্পরে

একই সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ আছে। এই তিনের মধ্যে একটীকে বশীভূত করিতে পারিলে, অন্য দুইটীও বশীভূত হইয়া যায়, তত্বদর্শী যোগিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু স্থূল শরীরের সহিত জীবের প্রথম সম্বন্ধ অবস্থিত থাকায় বীর্য্যরক্ষা বিষয়ে পরম সহায়ক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পুরুষশিক্ষার নিমিত্ত পরম আবশ্যক। অতএব ব্রহ্মচর্য্য, সদাচার, ধর্ম্মশিক্ষা, দেশ কাল জ্ঞান, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুরুষশিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

লৌকিক শিক্ষার প্রচার করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের বিচার কখনই করা উচিত নহে। বেদ ও বৈদিক বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ধর্ম্মের ক্রিয়া-সিদ্ধাংশের শিক্ষা দিতে হইলে, বর্ণাশ্রম অধিকার সম্বন্ধে বিচার রাখা অবশ্য উচিত। কিন্তু আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয়ের নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার করা না হইবে, সে পর্য্যন্ত সফলতার সম্ভাবনা নাই। ভারত বিজয়ের সময় মুসলমান জেতা কতগুলি সৈন্যবল লইয়া আসিয়াছিলেন? ভারতবর্ষকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিবার সময় ইংরাজ জাতির সহিত কত সৈন্য ছিল? মাসিক ছয় অথবা আট টাকা বেতনের জন্য আপন পিতা এবং ভ্রাতাদিগের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে পারে এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কুত্রাপি বিদ্যমান আছে কি? সাতশত বর্ষব্যাপী মুসলমানসাম্রাজ্য-কালে ছয় কোটী মুসলমান, এবং খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যের একশত বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতসন্তানের খৃষ্টান হইয়া যাইবার প্রধান কারণ কি? অর্থলোলুপ বৈদেশিক বণিক্‌দিগের অল্প যত্নের দ্বারাই ভারতবর্ষের অমূল্য শিল্পরাশি কেন বিনষ্ট হইয়াছে? পরমোদার, সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে ঘোরতর অমঙ্গলকর সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ কি? যে মহর্ষিগণের উপদেশরাশির মধ্যে কোথাও পরধর্ম্মবিদ্বেষের ছায়ামাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, উহাঁদেরই বংশধরগণের মধ্যে স্বধর্ম্মবিদ্বেষ এবং স্বধর্ম্মিবিদ্বেষের ঘোর অনল প্রজ্বলিত হইবার প্রধান কারণ কি? যে আর্য্যজাতির আদিনেতা এবং আদিশিক্ষক পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া কেবল জগৎকল্যাণ কামনায় পরোপকারব্রতধারী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, আজ তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত কি গৃহস্থ এবং কি সন্ন্যাসিগণ ঘোর আলস্যপরায়ণ, স্বার্থপর এবং প্রমাদগ্রস্ত হইয়াও সেই প্রাচীন পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেছেন না কেন?

বিচারবান্ ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় সকল শ্রেণীর প্রজা-সমূহের মধ্যে অজ্ঞানতার ঘোর প্রভাবই ইহার প্রধান কারণ। সার্ব্বজনীন শিক্ষার দ্বারাই আর্য্য জাতির এই ঘোরতর অভাব এবং বিপত্তি দূর হইতে পারে।

নামের সহিত বিষয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নামের প্রভাবও ভাব-শুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীমহামণ্ডলের বিদ্যাপ্রচার বিভাগের নাম বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে "শ্রীসারদামণ্ডল" রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। বিদ্যাপীঠ শ্রীকাশীপুরীমধ্যে এই কার্য্যবিভাগের কেন্দ্র-কার্য্যালয় রাখা কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্যালয়ের অধীন এক আদর্শ মহাবিদ্যালয় এবং আরও কতিপয় বিদ্যালয় রক্ষা করিয়া এই বিভাগের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে হইবে। কাশীপুরী ব্যতীত শ্রীনগর (কাশ্মীর), উজ্জৈনী অবন্তিকা), মথুরা (মধুপুরী). নদিয়া (নবদ্বীপ), পুণা (পুণ্যপত্তন), দ্বারভাঙ্গা (মিথিলা) এবং কাঞ্চী, এই সকল যে প্রাচীন বিদ্যাপীঠ আছে, সেই সকল মহাপীঠেও এক একটী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রাচীন বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব করা হউক। এই কার্য্য বিভাগ দ্বারা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে সকল সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার-পূর্ব্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধন করা হউক। সঙ্গে সঙ্গে সদাচার পালন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিচার সহ ছাত্রাবাসের স্থাপনাও করা হউক। প্রাচীন আচার্য্য-কুলবাস করিবার রীতি অনুসারে দ্বিজ বালকদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার পর সমাবর্ত্তন না করাইয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে রক্ষা করিয়া প্রাচীন রীত্য-নুসারে বেদশাস্ত্র শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত কাশী এবং অন্যান্য স্থানে, নগরের কিছু দূরবর্ত্তী কোন রম্যস্থানে "ব্রহ্মচারি-আশ্রম" স্থাপন করা হউক। পরন্তু ঐ সকল আশ্রমে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা-বিশিষ্ট বিদ্যার্থীদিগকে লওয়া হউক। এইরূপেও শিক্ষা কার্য্য সার্ব্বজনীন হইবে না। কাশী-আদি স্থানসমূহে এই সকল নিয়ম প্রচলিত হইলে অন্যান্য স্থানেও এইপ্রকার ব্যবস্থা অত্যন্ত বিবেচনার সহিত বিধিবদ্ধ করা এবং ধর্ম্ম-সভাসমূহকে এই কার্য্যে দত্তচিত্ত হইবার জন্য প্রবৃত্তি দান করা কর্ত্তব্য হইবে। যোগসাধন দ্বারা বীর্য্যরক্ষার সহায়তা, এবং নিত্য সংকল্পমন্ত্রের সংস্কার দ্বারা

জ্ঞানবৃদ্ধি এবং স্বদেশানুরাগাদি সদ্বৃত্তিসমূহের উন্নতি করাইতে যত্ন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এইরূপ ব্রহ্মচারি-আশ্রমের নামও বিশেষ রীতি অনুসারে রাখাও লাভজনক হইবে। ঐ সকল ব্রহ্মচারি-আশ্রমের নাম প্রতিষ্ঠাতা, নেতা অথবা আচার্য্যদিগের গোত্রানুসারে পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগের নামানুসারে রাখিলে তাহা উপকারী হইবে। যথা—শ্রীভরদ্বাজাশ্রম, শ্রীশাণ্ডিল্যাশ্রম ইত্যাদি।

মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিরই সম্পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না, মাতৃভাষার উন্নতি করিতে না পারিলে স্বধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইতে পারে না, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন মনুষ্যজাতি শীঘ্রই সফলতালাভ করিতে পারে না, মাতৃভাষার উন্নতিসাধন ব্যতীত দেশে জ্ঞানের পূর্ণরূপে বিস্তার হওয়া অসম্ভব, মাতৃভাষার উন্নতিসাধন ব্যতীত দেশের গৌরব কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না, মাতৃভাষার উন্নতিসাধন করিতে না পারিলে কোন জাতিই আপনার স্বজাতীয় ভাবের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, এবং মাতৃভাষার রক্ষায় সফলকাম না হইলে কোন মনুষ্য কখনও সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই সময় ভারতবাসীদিগের মাতৃভাষার স্থানে বিশুদ্ধ "হিন্দী" ভাষাই বুঝিতে হইবে। অল্প যত্ন করিলেই এই মাতৃভাষা সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত কেন্দ্ররূপে স্থাপিত হইতে পারে। ফলতঃ এক্ষণে দৃঢ়ব্রত হইয়া বিদ্যানু-রাগীদিগের এরূপ যত্ন করা উচিত, যাহাতে একখানি বৃহৎ শব্দকোষ সংগ্রহ এবং ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্যাদি নানা আবশ্যকীয় গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা এই মাতৃভাষা আপনার পূর্ণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহার পর পরম বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সংস্কৃত ভাষাকে পিতৃস্থানীয় এবং হিন্দী ভাষাকে মাতৃস্থানীয়া করিয়া জ্ঞানরাজ্যে লালিত পালিত হইলে ভারতবাসিগণের সকল অভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইতে পারিবে। অপিচ প্রথমেই হিন্দী ভাষার পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন। তাহার পর উচ্চ কক্ষাসমূহে সং-স্কৃত ভাষার শিক্ষা সুগম রীতি অনুসারে প্রদত্ত হইতে হইতে সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃ-ভাষার দ্বারা দেশ কাল সম্বন্ধীয় অন্যান্য শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন করান যুক্তিযুক্ত হইবে। যদি এরূপ সু-অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মধ্যে একমাত্র হিন্দী ভাষাই মাতৃভাষা হইয়া যায়, তবে বিস্তর লাভেরই সম্ভাবনা

আছে। যদি এরূপ কার্য্য এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে সাধিত করিতে পারা না যায়, তবে এক্ষণে এরূপ যত্ন করা উচিত যে, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব আদি প্রান্তসমূহে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহমধ্যে যথায় বিভিন্ন মাতৃভাষাসমূহ তত্তদ্দেশীয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে, তথায় প্রবৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক একমাত্র "দেবনাগরী" অক্ষরের প্রচার করা হউক। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সার্ব্বজনীন ক্রমোন্নতি, বিদ্যার বিস্তার, এবং জাতীয় ভাবের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ মানবজাতির মঙ্গলের নিমিত্ত বিদ্যার অনন্ত ভাণ্ডাররূপী অগণিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই কল্পের উপযোগী সমস্ত বিষয় ঐ সকল ত্রিকালদর্শী আচার্য্যগণ সূত্ররূপে অথবা সংক্ষেপতঃ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালপ্রভাবে এক্ষণে সেই সকল গ্রন্থের সহস্রাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের ধ্বংসাবশেষ যে সকল অংশ আজিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এখনও সেই সকল অংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা আর্য্যসন্তানমাত্রেরই উচিত। যদি কখনও আর্য্যজাতির পুনরুন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তবে অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ অবলম্বন দ্বারাই তাহা হইতে পারিবে। পুরুষ-শিক্ষোপযোগী ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের অত্যন্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক গ্রন্থসমূহের তো সহস্রাংশও পাওয়া যায় না। দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অনেক সিদ্ধান্তগ্রন্থই নষ্ট হইয়াছে, এবং কোন কোন দার্শনিক মতের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে বুঝিতে পারা যায় যে, বেদের কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিন কাণ্ড অনুসারে যে কর্ম্মমীমাংসা, দৈবী মীমাংসা এবং ব্রহ্ম-মীমাংসার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু সিদ্ধান্তগ্রন্থ ছিল, সেই সকলের মধ্যে দৈবী মীমাংসার একখানি গ্রন্থও এ পর্য্যন্ত উপলব্ধ হয় না। এই প্রকারে সপ্ত দর্শনসিদ্ধান্তের অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়ায় দার্শনিক শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। বিশেষতঃ কোন কোন দর্শনের মধ্যে অনেক নবীন লৌকিক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া লৌকিক সুবিধার নিমিত্ত সেই সকল গ্রন্থের অধিক প্রচার হইয়া যাওয়ায় দার্শনিক শিক্ষা প্রাপ্তির মধ্যেও অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থা হইতে বিদ্যার্থিগণকে আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ আর্ষ ভাষা অধ্যাপনা না করাইয়া

নবীন কাব্যসমূহের শিক্ষা দেওয়ায় তাহাদিগের দার্শনিক বুদ্ধির হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এই সকল কথার বিচার করিয়া ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, আচারশিক্ষা, দর্শনশিক্ষা, সাধনশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা, পদার্থবিদ্যাশিক্ষা, অর্থনীতিশিক্ষা, আয়ুর্ব্বেদ, শিল্প, কলা-আদি শিক্ষার উপযোগী সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রণয়ন করা উচিত হইবে। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার সময় ইহাও অবশ্য বিচার কর উচিত যে, আমাদিগের যে সকল শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিষয় এ সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিছু নূতন আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন (যথা আয়ুর্ব্বেদ), সেই সকলের সংগ্রহ, সংস্কৃত টিপ্পনী রূপে, সেই সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হওয়া সর্ব্বথা কল্যাণকারী হইবে। উদাহরণস্থলে বুঝিতে হইবে যে, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র-আদি শাস্ত্রের কতগুলি গ্রন্থ আমাদিগের ছিল, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলতঃ এই সময়ে উক্ত শাস্ত্রসমূহের সম্বন্ধে যে সকল নূতন আবিষ্কার পাশ্চাত্য জগতে পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই সকলের সংগ্রহ আমাদিগের গ্রন্থসমূহের টিপ্পনীমধ্যে সন্নিবেশ-পূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইলে অনেক লাভজনক হইবে।

অযোগ্য ব্যক্তির তিরস্কার এবং যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার ব্যতীত কোন নিয়মের সুরক্ষা হইতে পারে না। অতএব বিদ্যার বিস্তার এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পুনরভ্যুদয় সাধন করিবার নিমিত্ত সমাজমধ্যে অযোগ্য পুরুষসমূহের অনুশাসন এবং উপযুক্ত পণ্ডিতদিগের পুরস্কার দান করিবার অনেক সুকৌশলপূর্ণ যুক্তির আবিষ্কার করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে পুরস্কৃত করিবার পক্ষে অধিক মনোযোগ করিতে হইবে। যাহাতে তীর্থসমূহে, ধর্ম্মস্থানসমূহে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সৎকার বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সমাজ এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা বিদ্বান্‌দিগের অধিক সেবা হইতে পারে, যাহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহে রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং শেঠ সাহুকারদিগের দ্বারা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বদা এ বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্থ আশ্রম সকল আশ্রমের মূল-স্বরূপ। অতএব সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থগণ যাহাতে সমাজমধ্যে অধিকরূপে সম্মানিত হইতে পারেন, তাহার উপায় করা উচিত। গৃহস্থদিগের পুরোহিত-আদি পদ যেন যোগ্য ব্যক্তিদেরই দেওয়া হয়, এরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পুনঃপ্রবর্ত্তন

করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যাহাতে বিদ্যার্থীরা সদাচারী, স্বদেশ-হিতৈষী এবং নিঃস্বার্থব্রতধারী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ সদ্‌গৃহস্থের উপযোগী হইতে পারে। যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের ক্রমোন্নতি হইলেই আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয় হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ সময়ে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণধর্ম্মের উন্নতি এবং বৈশ্যধর্ম্মের উন্নতি হইলেই আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয়ের প্রারম্ভ হইতে পারিবে। অতএব ব্রাহ্মণধর্ম্মোন্নতিকারী শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতির উপযোগী শিক্ষারও বিস্তার হওয়া উচিত।

ইহাতে ত সন্দেহই নাই যে, যতদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসিগণ নিষ্কাম ব্রতের পরা কাষ্ঠায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা লোকহিতকর কার্য্যসমূহে রত না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির উন্নতি হওয়া অসম্ভব ; কিন্তু এইরূপ লক্ষ্য-সাধনার্থ সন্ন্যাস এবং গৃহস্থাশ্রমের মধ্যাবস্থায় সুকৌশলপূর্ণ শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। এই সময় বানপ্রস্থাশ্রমধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে নির্ব্বাহ হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। এই নিমিত্ত এইপ্রকার যুক্তি পুরুষার্থানুকূল হইতে পারে যে, গৃহস্থ আশ্রমের অন্তর্গত একটী নিবৃত্তিমার্গ শ্রেণীর আবিষ্কার করা হউক, এবং ঐরূপ সন্ন্যাসের পরমহংসদশা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে হংসদশা, বহূদকদশা, কুটীচরদশার এরূপ সাধনক্রম শাস্ত্রানুকূলরূপে রক্ষিত হউক যে, যাহাতে সন্ন্যাসীদিগের পতন না হইয়া তাঁহারা ক্রমোন্নতি করিতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতি এবং দেশের সেবায় সফলকাম হইতে পারেন। গৃহস্থ-দিগের মধ্যে যে শ্রেণী নিবৃত্তিমার্গগামী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া এরূপ সংস্কারের অধীন করিয়া পরিচালিত করা হউক, যাহাতে তাঁহারা আপনাদিগের বিলাসবুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদিগের অভাবসমূহের সংকোচ করিতে করিতে নিবৃত্তিমার্গ দ্বারা কর্ম্মযোগের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ঐ-প্রকার উপায়ের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের প্রথমাবস্থায় শিখাসূত্র রক্ষা করাইয়া তাঁহাদিগকে এপ্রকার সাধন করান হউক, যাহা হইতে তাঁহাদিগের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে। কুলকামিনীদিগের মধ্যেও এইপ্রকার নিবৃত্তি-মার্গের শিক্ষা পুনঃপ্রচার হইয়া গেলে, তাঁহারা পতির সহিত অবস্থান করিবার সময় সহধর্ম্মিণীরূপে সংসারের কল্যাণব্রতে ব্রতী থাকিতে পারিবেন, এবং

পতিবিয়োগ হইলে আপনার পাতিব্রত্যতপের রক্ষা করিতে করিতে সমাজ এবং জাতির সেবায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এরূপ হইলে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সহায়তায় আর্য্য স্ত্রী এবং পুরুষগণ চারি আশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার হেতু হইয়া যাইবেন।

কেবল সুপথ্য সেবন করিলেই প্রবল পীড়ারও শান্তি হইতে পারে। ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত সুপথ্য দ্বারাই রোগের শান্তি হওয়া সম্ভব। আর ইহাও নিশ্চয় যে, উত্তম ঔষধ হইলেও যদি সুপথ্য সেবন করা না হয়, তবে রোগ বিনষ্ট হয় না। ফলতঃ এ সময় আর্য্যজাতিকে সুপথ্য সেবন করাইবার বিশেষ উদ্যোগ হওয়া উচিত। সুতরাং উত্তম বিজ্ঞানপূর্ণ এবং সুকৌশলযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা এবং পুরুষশিক্ষার দ্বারা বর্ত্তমান সামাজিক ঘোর ব্যাধির আপনা-আপনিই শান্তি হইতে পারিবে।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বীজ রক্ষা।

ধর্ম্ম-নির্ণয়কারী শাস্ত্রসমূহ ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহা হইতে অভ্যুদয় (অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ ও উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়স (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্তি হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্মের এরূপ লক্ষণসমূহের বিষয়ে স্বয়ং বেদই প্রমাণ *। যেপ্রকার ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়রূপিণী ক্রিয়াই সংসার ধারণ করিয়া আছে, এবং বৃহৎ গ্রহসমূহ হইতে একটী মাত্র অণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই এই ত্রিগুণাত্মক নিয়মের অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছে, ঐ রূপে জীবগণও এই নিয়মের অধীন আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ আছে যে, জড় পদার্থসমূহের নাশ তমোগুণ দ্বারা এবং চেতনময় জীবসমূহের লয় সত্ত্বগুণের সহায়তায় হইয়া থাকে। জড় পদার্থ-সমূহ রজোগুণের সহায়তায় ক্রমশঃ পরিণামী হইয়া পূর্ণ তমোগুণ ধারণ করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু চেতন রাজ্যের অধিকারী জীবগণ রজো-গুণের সহায়তায় ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে করিতে পূর্ণ সত্ত্বগুণের পরিণাম প্রাপ্তিপুরঃসর মুক্ত হইয়া থাকেন। আপনার মধ্যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা অর্থাৎ ক্রমশঃ পূর্ণ চৈতন্যময় সাত্ত্বিক ভূমির অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই জীবগণের পক্ষে ধর্ম্ম। এই অভ্রান্ত সৃষ্টিনিয়মের অনুসারে সৃষ্টিপ্রবাহমধ্যে প্রবাহিত হইয়া জীবগণ ক্রমশঃ জন্মমরণরূপী পরিণাম প্রাপ্ত হইতে হইতে উন্নত হইয়া পরিশেষে জ্ঞানপূর্ণ মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া থাকে এবং তৎপশ্চাৎ ক্রমশঃ সত্ত্ব-গুণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দ্বারা জন্মান্তরে পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া মুক্তিরূপী পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

---

* যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ, তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।

ইহা বৈশেষিক দর্শন-কথিত লক্ষণ। সনাতন ধর্ম্মের বিস্তারিত লক্ষণের প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ আর্য্যজাতির দশা পরিবর্ত্তন নামক অধ্যায়ের ১ম টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মভূমির প্রতি অগ্রসর মনুষ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম রজোমিশ্রিত সাত্ত্বিক, এবং দ্বিতীয় পূর্ণ সাত্ত্বিক অধিকারী। রজোমিশ্রিত সাত্ত্বিক অধিকারীদিগের মধ্যে বিষয়বাসনা অবস্থিতি করায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ইহলৌকিক সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য ও স্বাধীনতা এবং দেহান্তে উন্নত স্বর্গাদিলোক সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ণ সাত্ত্বিক অধিকারী-দিগের মধ্যে বিষয়বাসনার লেশমাত্রও অবস্থিতি করে না বলিয়া তাঁহারা সত্ত্বগুণের পূর্ণতার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। এই উপরি উক্ত দুইপ্রকার অধিকারের মধ্যে দুইটীতেই লয়ের অভিমুখে ক্রমোন্নতির গতি বিদ্যমান থাকায় উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মভাব অবস্থান করে। এই নিমিত্ত অবস্থা-ভেদে ঐ উভয় অধিকারীকেই ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের মূলভিত্তিরূপ বেদের প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মের এই দুই অধিকারের সিদ্ধি স্বতঃই হইতে পারে। অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞারূপ বেদসমূহ যখন সম্পূর্ণ-রূপে অভ্যুদয় এবং মোক্ষ এই উভয়প্রকার লক্ষ্য সাধনোদ্দেশে প্রকরণভেদে আজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন, বেদসমূহমধ্যে অবস্থা এবং অধিকারভেদে যখন উভয় লক্ষ্যের বর্ণন দেখা যায়, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেদ দ্বারা এই দুই ধর্ম্মমার্গেরই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বেদসমূহে স্বর্গপ্রদ কর্ম্মকাণ্ড এবং মুক্তিপ্রদ জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। যদিও বেদ-সমূহে জ্ঞান, উপাসনা এবং কর্ম্ম এই তিন কাণ্ডই স্বতন্ত্ররূপে আছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিপ্রদ উপাসনাকাণ্ডকে পূর্ব্বোক্ত উভয় কাণ্ডেরই সহায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ড অথবা জ্ঞান-কাণ্ড উভয়েরই সিদ্ধি হইতে পারে না। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা যখন বিচার করা যায়, তখন যদিও বেদসমূহের লক্ষ্য মোক্ষসাধনের উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ বেদ মোক্ষসাধনার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে আদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর্গাদি আভ্যুদয়িক ফলপ্রদ সকাম কর্ম্মের বিস্তৃত বর্ণনও শ্রুতিসমূহে আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বেদ যাহা কিছু উপদেশ প্রদান করেন, সে সমস্ত সত্যের উপরই প্রতি-ষ্ঠিত, এই নিমিত্ত এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে যে, বেদের লক্ষ্য একমাত্র সত্যরূপ কৈবল্যপদের প্রতি কেন রহিল না? স্বর্গ এবং মোক্ষ এই দ্বিবিধ

লক্ষ্য থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্টতার দোষ কেন না স্বীকার করা যায়? এইরূপ বিবিধ পূর্ব্বপক্ষের এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, যদিও মুক্তিরূপ কৈবল্য-পদই বেদের লক্ষ্য এবং যদিও মুক্তিপ্রাপ্তির কারণরূপ আত্মজ্ঞানের উন্নতি করাই জীবগণের পরমধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়, তথাপি সকল মনুষ্যই কিছু মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না। কারণ, অনাদি বাসনাসমূহের নাশ একেবারে সকল অধিকারীর অন্তঃকরণে হইতে পারে না। বরং বাসনাযুক্ত অধিকারীরই সংখ্যা ইহ জগতে অধিক। এই নিমিত্ত যদি জীবগণের মধ্য হইতে অসৎ বাসনাসমূহের নাশ করাইয়া সৎ বাসনাসমূহের বৃদ্ধি দ্বারা তাঁহাদিগকে সত্ত্বগুণের রাজ্যমধ্যে অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাঁহারা যে পূর্ব্বোক্ত পরমধর্ম্মরূপী ঐ মুক্তিপদের অনুগামী হইতেছেন, ইহা কি বুঝিতে হইবে না? সৎ-বাসনাযুক্ত হইয়া যদি সাধকগণ সাত্ত্বিক সকাম কর্ম্মসমূহ সাধন করেন, তবে ঐ মধ্যমাধিকারীরা পুনরায় অধোগতি প্রাপ্ত হইতেই পারে না, এবং এই প্রকারে সৎ-বাসনাযুক্ত হইয়া জন্মান্তরে ক্রমশঃ স্বর্গাদি উন্নত লোক প্রাপ্তিপুরঃসর জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নত কক্ষসমূহ লাভ করিতে করিতে শেষে জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তিপুরঃসর মুক্তিপদের অধিকারী হইতে সক্ষম হইবেন। সাত্ত্বিক স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হইতে জ্ঞানাধিকারের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এই নিমিত্ত স্বর্গপ্রদ সকাম কর্ম্মাধিকারও ধর্ম্মশব্দবাচ্য। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর অবস্থিতিপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিরূপ বেদসমূহ অভ্যুদয় এবং মোক্ষ উভয় অধিকারের কর্ম্মসমূহকে ধর্ম্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই কারণেই সনাতনধর্ম্ম পরমোদার এবং সর্ব্বজীব-হিতকর।

যেপ্রকার সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান আছেন, সেইপ্রকার পূর্ণ বিজ্ঞানযুক্ত নিত্যসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের সত্তা সকল ধর্ম্মেই বিদ্যমান আছে। সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই সনাতন ধর্ম্মের নানা অঙ্গ হইতে কোন না কোন অঙ্গের জ্যোতিঃ গ্রহণ করিতে করিতে ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মের প্রধানতঃ তিনটী অঙ্গ আছে। যথা—যজ্ঞ, তপ এবং দান *। যজ্ঞের প্রধানতঃ তিনটী

* যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।
ইত্যাদি গীতোপনিষদ্।

অঙ্গের নাম কর্ম্মযজ্ঞ, উপাসনাযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ। কর্ম্মযজ্ঞের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূতরূপে ছয়টী ভেদ আছে। উপাসনার মধ্যে সগুণ, নির্গুণ, বহির্ ও অন্তর্‌রূপে কয়েকটী প্রকারভেদ দেখা যায়। আবার মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ-ভেদে অনেক রূপ আছে। এতদ্ব্যতীত স্তুতি, জপ এবং ধ্যান-আদি সাধনভেদেও বহু প্রকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উপাসনা-যজ্ঞাঙ্গের প্রধান ভেদ করিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, উহার পূর্ব্বোক্ত চারি যোগাঙ্গ মত চারি ভেদ এবং ব্রহ্মোপাসনা, সগুণ পঞ্চোপাসনা, অবতারোপাসনা, ঋষি-দেবতা-পিতৃ-উপাসনা এবং ভূতপ্রেতাদি নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, এরূপ বিভাগ করিলে উপাসনার প্রধানতঃ নয়টী বিভাগ করা যাইতে পারে। জ্ঞানযজ্ঞের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং পরোক্ষ, অপরোক্ষ ভেদে অনেক রূপ আছে। তপঃসাধনের শারীরিক বাচনিক এবং মানসিক ভেদে কয়েকপ্রকার ভেদ আছে। দান ধর্ম্মের মধ্যে অভয় দান, বিদ্যা দান এবং অর্থ দানরূপ অনেক অঙ্গ আছে, এবং পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মের নানা অঙ্গসমূহের আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন তিন রূপ আছে। ফলতঃ সনাতন ধর্ম্ম বহু অঙ্গ ও উপাঙ্গে বিভক্ত।

সনাতন ধর্ম্মের এই সকল অঙ্গের কোন একটীরও পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক রীতি অনুসারে সাধন করিলে মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নির একটীমাত্র স্ফুলিঙ্গও সম্পূর্ণরূপে দহনকার্য্যে সমর্থ হইতে পারে। এই কারণে অহিংসা এবং জ্ঞানযোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে মান্য হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকা কেবল সত্যপ্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, গুণপূজা, জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এবং নিয়মপালনাদি সামান্য ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের সাধন হইতে এক্ষণে জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জাপানে এই সকল গুণ ব্যতীত বৃদ্ধসেবা, পিতৃপূজা, রাজভক্তি, ধৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মবৃত্তির আরও অধিক উন্নতি হওয়ায় সেই ক্ষুদ্রদেশ আজ ইউরোপ এবং আমেরিকার দাম্ভিক অধিবাসীদিগের দ্বারা সম্মানিত হইতেছে। যে যে বৃত্তির নাম উল্লেখ করা গেল, সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসমূহের সহিত মিলাইলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, ঐ সকল বৃত্তি সেই সমস্ত অঙ্গের উপাঙ্গ মাত্র। ধর্ম্মের অঙ্গসমূহের সহিত ধর্ম্মোপাঙ্গসমূহের সম্বন্ধ দেখিতে হইলে এইরূপ বিবেচিত হইয়া

থাকে ; যথা—সত্যপ্রিয়তা মানসিক তপের উপাঙ্গ, স্বার্থত্যাগ অবস্থাভেদে তপের এবং দানের উপাঙ্গ হইয়া থাকে। এবং ঐ স্বার্থত্যাগ যদি আবার দেশের কিম্বা জাতির জন্য সমষ্টিসম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা মহাযজ্ঞের উপাঙ্গ হইবে। এইরূপে পিতৃপূজা উপাসনাযজ্ঞের উপাঙ্গ, এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম কর্ম্মযজ্ঞের উপাঙ্গ। এই প্রকারে একটী ধর্ম্মাঙ্গের বহু উপাঙ্গ হইতে পারে। আবার একটী ধর্ম্মবৃত্তি অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের উপাঙ্গ হইতে পারে ; যেমন—স্বার্থ-ত্যাগ মানসিকবৃত্তি-প্রধানতায় হইলে উহা তপের উপাঙ্গ, এবং দানাদি দ্বারা প্রকাশিত হইলে উহা দানধর্ম্মের উপাঙ্গ হইবে। সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসমূহের বিস্তার বিষয়ে বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ মনোযোগ করিলেই সপ্রমাণ হইতে পারিবে যে, সনাতন ধর্ম্মের কোন না কোন অঙ্গ উপাঙ্গের সহায়তায় সমস্ত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, সত্য, অক্রোধ-আদি ধর্ম্মবৃত্তিসমূহ সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সমাজের মনুষ্যগণকে সমানরূপে অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব সম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কিছুমাত্র সন্দেহই থাকিতে পারে না।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, সনাতন ধর্ম্মই পরম্পরা সম্বন্ধে অপর সমস্ত ধর্ম্মমার্গের আদিগুরু। সনাতন ধর্ম্মই বহুপুত্রবান্ পিতার ন্যায় পৃথিবীর বৈদিক অথবা অবৈদিক সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই প্রতিপালক। বৈদিকাচার, স্মার্ত্তাচার, পৌরাণিকাচার, এবং তান্ত্রিকাচারের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণ বিজ্ঞান বিদ্যমান আছে ; বেদ এবং বেদসম্মত সকল শাস্ত্রই যে, সনাতনধর্ম্মের সকল অঙ্গের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। বেদ এবং বেদসম্মত সমস্ত শাস্ত্রে যদিও অধিকারভেদে মতপার্থক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিবর্গের বিচারে বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্তমধ্যে কোনও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মলক্ষণের পূর্ণ স্বরূপ বেদসম্মত সকল শাস্ত্রেই পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, কর্ম্মমীমাংসা, দৈবী মীমাংসা, এবং ব্রহ্মমীমাংসা এই সাতটি বৈদিক দার্শনিক মত অথবা উপাসক সম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টা-দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং দ্বৈত প্রভৃতির যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, সেই সকলের

মধ্যে সামান্যরূপ বিচারতারতম্য থাকিলেও অভ্যুদয় এবং মোক্ষরূপী লক্ষ্য বিষয়ের নির্ণয় সম্বন্ধে সকলেই একমতাবলম্বী। মোক্ষের স্বরূপ বিচারপক্ষে এ সকলের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-যুক্ত বেদান্ত-বিজ্ঞানই মুক্তির নির্ণয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত মত। পরন্তু এই সকল দার্শনিক মতভেদের কারণ জ্ঞানভূমির তারতম্য অথবা অধিকারভেদ স্বীকার করিলে, সমস্ত দর্শনই যে সনাতনধর্ম্মপ্রতিপাদক, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

এই সকল সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতবর্ষে এক্ষণে নানকপন্থ, রামসনেহীপন্থ, কবীরপন্থ, দাদূপন্থ, গরিবদাসীপন্থ, স্বামী নারায়ণপন্থ, গোরখপন্থ, নির্ম্মলপন্থ, রামানন্দী পন্থ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মপন্থ প্রচলিত আছে। যে সকল মতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে এবং যাহাতে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স এই দুই লক্ষ্যই যথাযথরূপে রক্ষিত হইয়াছে, উহাকেই সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। উহার অন্যথা হইলেই পন্থ বলা যাইবে। যদিও এই সকল পন্থের মধ্যে নিম্নাধি-কারেরই পন্থ অধিক, কিন্তু এই সকল পন্থের মধ্যে কোন কোন পন্থ এরূপ উন্নত যে, তাহারা পূর্ব্বকথিত সম্প্রদায়সমূহের নিকটবর্ত্তী অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় যে, মহাত্মা গুরু নানকজী-স্থাপিত নানকপন্থ বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছে। শিখ জাতির শৌর্য্য, দেশানুরাগ, এবং উদাসী সাধুদিগের ত্যাগ এবং জ্ঞাননিষ্ঠা এখনও পর্য্যন্ত এই পন্থের মহত্ত্বের কারণ হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকথিত সম্প্রদায়-সমূহ এবং এই সকল পন্থ-সমূহের সহিত এই পর্য্যন্ত পার্থক্য আছে যে, বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্রই উক্ত সম্প্রদায়সমূহের আধার কিন্তু এই সকল পন্থগুলির আচার্য্যগণ আর্য্যশাস্ত্রানুশাসন ব্যতীত কিছু নূতনত্বও করিয়া লইয়াছেন। এই সকল পন্থের মধ্যে একটী বিশেষত্ব এই আছে যে, ব্যবহারিক দশায় ইঁহারা এখন পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদার সম্মুখে অবনতমস্তক হইলেও, প্রকৃত পক্ষে চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের স্থানে ইঁহারা কেবল দুইটি আশ্রম এবং দুইটি বর্ণই* রাখিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতানুসারে যদিও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির কোন বিচার

* তন্ত্র এবং পুরাণসমূহে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবার সময় উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে দুই বর্ণ এবং দুই আশ্রমই জীবিত থাকিবে।

নাই, কিন্তু তাঁহারা এরূপ স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তিনি শূদ্রবৎ; এবং যে ব্যক্তি ঐ সকল পন্থের দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তি তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে উন্নত কক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণবৎ প্রতীত হয়েন। এই রীতি অনুসারে যদিও তাঁহাদিগের পন্থের মধ্যে চতুরাশ্রমের কোন বিধিই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগের দীক্ষাক্রমের দ্বারা তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল গৃহস্থ এবং সন্ন্যাস এই দুইটী আশ্রমের বিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বাস করে, সেই ব্যক্তিই গৃহস্থ; এবং যে ব্যক্তি বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই বৈরাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসিবৎ, ইহাই বুঝিতে হয়।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান কালে চতুর্থাশ্রম নামের দ্বারা যে সকল আড়ম্বর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা বিস্ময়কর। প্রাচীন কালে চতুর্থাশ্রমের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণই উপস্থিত হইতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে নীচ হইতে অতি নীচ জাতি পর্য্যন্ত এই আশ্রমের বেশ এবং নাম গ্রহণ করিয়া বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মের নাশ করিয়া থাকে *। এইপ্রকার পন্থাই অনাচার হইতে সনাতন ধর্ম্মের বহুল পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সনাতন-ধর্ম্ম-বিজ্ঞানানুসারে ধর্ম্মাঙ্গসমূহকে যথাসম্ভব প্রতিপালন করিতে করিতে ঐ সকল সম্প্রদায় স্বর্গ এবং মুক্তি উভয়েরই অনুগমন করিতেছে এবং এই শেষ লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত সম্প্রদায়গুলি এবং পন্থগুলি সকলেই বেদানুগামী ইহা বলিতে হইবে। এই পন্থসমূহের মধ্যে কোন কোন পন্থ এরূপ উন্নত আছে যে, তাহাদিগের চরম লক্ষ্য বেদান্ত-বিজ্ঞানের উপরই রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল পন্থের দ্বারা এই জাতির বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেও বহুল পরিমাণে সহায়তা হইতেছে।

এই সময়ে ভারতভূমিতে প্রধানতঃ আরও এরূপ দুইটী মত প্রচলিত আছে

* শাস্ত্রসমূহে কেবল ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত আছে। কিন্তু এক্ষণে কলির প্রভাবে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী রূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সাধুদিগের সংখ্যা গবর্ণমেণ্ট সেন্সস অর্থাৎ মরদুম শুমারীর রিপোর্ট অনুসারে ৫২ লক্ষ। এই সংখ্যার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সাধু আছে বুঝিতে হইবে। ইহা কলিকালের ঘোর পরিণাম।

যে, তাহাদিগের আচার সনাতনধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাদিগকে বেদানুগামী বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্য্যসমাজ এই দুই মত ধর্ম্মপুরুষার্থ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিয়মিত কার্য্য করিতেছে দেখা যায়। আর্য্যসমাজের প্রধান লক্ষ্য বেদের অঙ্গবিশেষের উপর পরিলক্ষিত বলা যাইতে পারে। কেবল তাহারা জন্মের সম্বন্ধ বর্ণধর্ম্মের সহিত স্বীকার করে না। নিয়োগ, বিধবা বিবাহপ্রচার, সগুণ-উপাসনাত্যাগ, পিতৃপূজারূপী শ্রাদ্ধাদির খণ্ডন ইত্যাদি নিন্দনীয় কার্য্যসমূহের প্রচার করায় সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত উঁহাদের সম্বন্ধের ন্যূনতা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সহিত আর্য্য সমাজের প্রায় একই সম্বন্ধ আছে, উভয় সমাজের আচারের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই, কেবল ব্রাহ্মসমাজে এইমাত্র আধিক্য আছে যে, তাহারা বেদসমূহের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, পরন্তু সনাতনধর্ম্মের মুক্তিবিজ্ঞানের সহিত উভয় সমাজের বিরোধ আছে, উভয় সমাজই স্বর্গসুখের ন্যায় অধিককাল স্থায়ী অলৌকিক সুখভোগকেই মুক্তি বলিয়া বিবেচনা করে। তথাপি সাধারণতঃ বেদানুগমন, স্থূল রীতি অনুসারে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদার পালন, স্বর্গেরই রূপান্তর মুক্তিপদ এবং স্বর্গপদের পার্থক্য স্বীকার করা ইত্যাদি কারণে ইহারা যে কিয়ৎ পরিমাণে বেদানুগামী, তাহা বলা যাইতে পারে। দূরদর্শী ব্যক্তিগণ ইহা বিচার করিয়া থাকেন যে, উহারা নিজকুলদ্রোহী হইলেও কালান্তরে সনাতনধর্ম্মের সহিত বিরোধের ন্যূনতা করিয়া একটি পন্থরূপে পরিণত হইতে পারিবে।*

সমস্ত পৃথিবীমধ্যে অন্যান্য বড় বড় ধর্ম্মমতের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ বিচার করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম এবং অগ্নিপূজক পার্শী ধর্ম্মের নাম প্রথমেই লওয়া উচিত। এই সকলের মধ্যে প্রথম দুই মতের সকল ধর্ম্মাচার্য্যই আর্য্যসন্তান ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতবর্ষ হইতেই উক্ত দুইটী মত বিস্তৃত হইয়াছে। তৃতীয় ধর্ম্মমতের আচার্য্যগণও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সনাতন ধর্ম্মের সহায়তা লইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের প্রধান আচার্য্য ভারতবাসী ছিলেন, ইহা প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে সপ্রমাণ হয়।

বৈজ্ঞানিক ভাবের উন্নতির বিচার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মকে উত্তম বলা যাইতে

* বিচারের সূক্ষ্মতার জন্য ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্ম লক্ষ্য অনুসারে সম্প্রদায়, পন্থ এবং মত এই তিন নাম দেওয়া হইয়াছে।

পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা না থাকিলেও উহার অধিকারী-দিগের মধ্যে প্রকারান্তরে যে, সময়ে সময়ে ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষাত্রতেজের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা ইতিহাস-সিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মে, বেদোক্ত দর্শনসমূহের সহিত এরূপ সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান জ্ঞানকাণ্ড, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের সহিত প্রায়ই মিলিতে মিলিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈন-ধর্ম্মের চরম মুক্তিলক্ষ্য, কর্ম্মবিজ্ঞান, জন্মান্তরবাদ, স্বর্গ এবং মোক্ষের পার্থক্য-আদি কতকগুলি প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত সনাতন ধর্ম্মের অনুযায়ী। কেবল মুক্তির পক্ষে সচ্চিদানন্দ ভাবের অভাব, ঈশ্বরবিজ্ঞানের উপর অবিশ্বাস, বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা ত্যাগ, এবং সদাচারের অপলাপ প্রভৃতি এরূপ কতকগুলি বিষয় আছে যে, তাহার নিমিত্ত ঐ ধর্ম্মসমূহকে অবৈদিক মত বলা যায়। পরম আস্তিক এবং ভগবৎপ্রেমাসক্ত অনাদি সনাতন ধর্ম্মের যদিও এই দুই ধর্ম্মমতের সহিত অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ঐ দুই ধর্ম্মে ভগবদ্‌ভক্তির অভাব দেখিয়া পিতৃরূপী সনাতন ধর্ম্ম, এই দুই ধর্ম্মমতকে উদ্ধত এবং কুলাচারত্যাগী পুত্রের ন্যায় শাসন করিয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মে যে সকল দোষ আছে, সে সকল আধিদৈবিক সম্বন্ধ দ্বারা দূর হইতে পারিত, সেই জন্য সনাতনধর্ম্মরূপী পিতার তাড়না ; নতুবা সনাতন ধর্ম্ম, অপর ধর্ম্মমতের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে জানে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবীর সকল বৈদিক এবং অবৈদিক ধর্ম্মমতসমূহই সমদর্শী সনাতন ধর্ম্মের নিকট পুষ্টি এবং তুষ্টির যোগ্য, কেবল আচারের তারতম্যানুসারেই ধর্ম্মমত-সমূহকে বৈদিক এবং অবৈদিক সংজ্ঞায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সনাতন ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ রক্ষাকারী সম্প্রদায় এবং পন্থসমূহের মধ্যেও লঘু হইতেও লঘু বিচার প্রচলিত আছে, এবং পক্ষান্তরে অবৈদিক ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যেও কোন কোন মতের মধ্যে অতি উন্নত বিচার সকল দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সদাচারপক্ষপাতী পূর্ণজ্ঞানযুক্ত সনাতন ধর্ম্ম তাহাদিগকে সদাচারবিহীন দেখিয়া অগত্যা অবৈদিক নামে অভিহিত করে।

সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কিরূপ-নিরপেক্ষ এবং সার্ব্বভৌম দৃষ্টি আছে, তাহা বিচারবান্ ব্যক্তিমাত্রেই সাধারণ বিচার দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, বেদ-বিরুদ্ধ মার্গ হইলেও তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ বুদ্ধ দেব ও শ্রীভগবান্ ঋষভ দেবের প্রশংসা করিতে ন্যূনতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহা-

দিগের দ্বারা আপনাদিগের ধর্ম্মমার্গের বিশেষ কোন লাভ না হইলেও ঐ দুই মহাপুরুষের যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাদিগের এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, আপনাদিগের গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সর্ব্বজীবহিতকারী এবং অপৌরুষেয় সনাতন ধর্ম্মের মহিমা অপার।

যদিও সমস্ত পৃথিবীমধ্যে ভারতবর্ষকেই ধর্ম্মভূমি বলিয়া স্বীকার করা যায়, কারণ, ধর্ম্মের পূর্ণতার বিকাশ এই ভূমি হইতেই হইয়াছে; কিন্তু এই ভূমির ধর্ম্ম-জ্যোতি * প্রাপ্ত হইয়া আরব-আদি দেশেও অনেকগুলি নূতন ধর্ম্মমত প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাদিগের বিস্তার এখনও জগতে বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যথা—ইহুদীধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম এবং মুসলমানধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্মমতের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অতি অল্প বিচারের দ্বারাই পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, অভ্রান্ত যুক্তি-পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত অনাদি সনাতন ধর্ম্মের স্থূল বিচারের ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়া ঐ সকল নবীন ধর্ম্মমত প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মের আচার্য্যদিগের সনাতন ধর্ম্মের গম্ভীর সিদ্ধান্তসমূহ অবধারণ করিবার যোগ্যতা ছিল কি না, এ বিষয়ে বিচার করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের পশুবৎ দেশবাসি-গণের সে সময় সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত বুঝিবার যোগ্যতা ছিল না। ঐ সকল ধর্ম্মমতের আচার্য্যগণও কিছু সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না; দেশ, কাল এবং পাত্র-বিচার দ্বারা ধর্ম্মনির্ণয় করিবার শক্তি যে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মলক্ষণ বর্ণন করিবার সময় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, যাহার দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। যদিও শাস্ত্রে অভ্যুদয়ের অর্থ স্বর্গ এবং নিঃশ্রেয়সের অর্থ মোক্ষ বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাহার দ্বারা জীবসমূহের ক্রমোন্নতি হয়, তাহাকে অভ্যুদয় বলা যায়। এবং

* ইতিহাসজ্ঞ বিদ্বান্‌দিগের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ধর্ম্মপ্রচার জীবন প্রারম্ভ হইবার পূর্ব্বে মহাত্মা যিশুখৃষ্ট এবং মহাত্মা মহম্মদ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এবং পূর্ব্বকালে পারস্য, মিশর এবং গ্রীসদেশে ধর্ম্মজ্যোতি ভারতবর্ষ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ ঐ সকল স্থানের ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন না কোন প্রকারে যে ক্রিয়া জীবকে ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার করে, তাহাকে নিঃশ্রেয়স শব্দার্থের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। নিঃশ্রেয়সের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও বালকের চন্দ্রপ্রাপ্তির ইচ্ছার ন্যায়, অপর সকল ধর্ম্মমার্গের যথাধিকার লক্ষ্য নিঃশ্রেয়সের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং ইহাও স্বতঃই সপ্রমাণ হয় যে, অভ্যুদয়ের লক্ষ্য সকল ধর্ম্মমার্গে যথাধিকার আছে।

বাইবেল-আদি গ্রন্থ পাঠ করিলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট ইহাই সপ্রমাণ হইবে যে, ঐ সকল গ্রন্থের অনেক অংশ, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক ভাবসমূহ সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের ছায়া হইতে অনুবাদিত হইয়াছে, অথবা আমাদিগের আচার্য্যগণের উপদেশসমূহের ভাবান্তর করিয়া ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈলক্ষণ্য ইহাই আছে যে, সেই সকল বৈজ্ঞানিক অংশের ভাবার্থ আজি পর্য্যন্তও সেই সেই ধর্ম্মমতসমূহের আচার্য্য অথবা পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন না ; কিন্তু ভারতবর্ষের শাস্ত্রজ্ঞ সামান্য পণ্ডিতেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় উক্ত বচন সকল পাঠ করিবামাত্রই ঐ সকল বাক্যের গম্ভীরতা বুঝিতে পারেন। ইহার কারণ এই যে, কোন না কোন প্রকারে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক ভাব তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের বিদ্যায় বৈদিক অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত ভাবত্রয়ের বৈজ্ঞানিক রহস্যসমূহের প্রকাশ কিছুমাত্র না থাকায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই উক্ত শাস্ত্রীয় বচনসমূহের ভাবার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। যদিও সনাতন ধর্ম্মোক্ত গম্ভীর মুক্তি-বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-ভাবপূর্ণ বর্ণাশ্রমাচারাদি, বড় বড় বিষয়ের নামমাত্রও এই সকল নবীন ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যে নাই, যদিও সনাতন ধর্ম্মের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তযুক্ত, দার্শনিক বিচারের লেশমাত্রও এই সকল ধর্ম্মমতের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি ইহাও বিচারানুকূলই বলিতে হইবে যে, ঐ সকল ধর্ম্মমতের ঈশ্বরভক্তি, দান, তপস্যাদি ধর্ম্মাঙ্গসমূহের স্থূল অবলম্বন, তাঁহাদিগের স্বর্গসুখভোগের সদিচ্ছা, তাঁহাদিগের উপাসনাদির মধ্যবর্ত্তী স্তুতি এবং জপ সাধনের অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গ এবং উপাঙ্গ সনাতনধর্ম্মমূলক। যদিও তাঁহাদিগের অল্পদর্শী সিদ্ধান্তসমূহ বহুদর্শী সনাতন ধর্ম্মের নিকট বালকবৎ প্রতীয়মান হয়, তথাপি সমদর্শী ব্যক্তিগণের বিচারে ইহাই স্থির হইবে যে, বহুপুত্রবান্, স্নেহময় পিতার ন্যায় সনাতন ধর্ম্মই জ্ঞানজ্যোতির সহায়তা প্রদানপূর্ব্বক

পুত্ররূপে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী সাধক যখন আপনার হৃদয়কে ঐইরূপ সর্ব্বজীবহিতকারী উদার ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব্ব-মঙ্গলময়স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন, তখনই তিনি কর্ম্মযোগী নামে অভিহিত হইবেন, তখনই তিনি পরা ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবেন, এবং তখনই তিনি বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মসদ্ভাব (অদ্বৈত ভাব) লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

ধর্ম্মত্বরূপে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়, ধর্ম্মপন্থ এবং ধর্ম্মমতসমূহ তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট একই বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে, সতীত্বধর্ম্ম এবং আচারের সুরক্ষা দ্বারা যাহার পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছে, উহাকেই বৈদিক ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এবং যাহাতে ঐ সকলের অভাব আছে, তাহাকেই অবৈদিক ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের সকল অঙ্গ এবং উপাঙ্গ দ্বারা পূর্ণ এবং জ্ঞানের ষোড়শ কলা দ্বারা দীপ্তিমান্ যে সিদ্ধান্ত, উহাকেই সনাতন ধর্ম্ম সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে অঙ্গোপাঙ্গের অসম্পূর্ণতা আছে এবং জ্ঞানকলার ন্যূনতা আছে, ঐ সকল সিদ্ধান্ত তাহাদের নিজ নিজ অধিকারের তারতম্যানুসারে ধর্ম্মপন্থ এবং ধর্ম্মমতাদি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মানুগামী মহাত্মগণের দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়, উপসম্প্রদায়, ধর্ম্মপন্থ এবং ধর্ম্মমতসমূহ সমভাবে দেখিবার যোগ্য। সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্য পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ বলেন যে, যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের বাধা প্রদান করে, তাহা সদ্ধর্ম্ম নহে ; পরন্তু উহা কুধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, যে ধর্ম্ম সর্ব্বদা অবিরোধী থাকিতে পারে এবং সর্ব্বজীবহিতকারী হইতে পারে, তাহাকেই সদ্ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতে পারা যায় *। এইরূপ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিবার সময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যাহার দ্বারা বিভক্তরূপী সর্ব্বভূতের মধ্যে অবিভক্ত বিকার-হীন একমাত্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বিবেচনা করা উচিত †। ফলতঃ সার্ব্বভৌম বিজ্ঞানযুক্ত সমদৃষ্টিই আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বোত্তম

* ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব ॥
ইতি পূজ্যপাদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য।

† সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি এবং অনন্তরূপী বৈদিক ধর্ম্ম পরমকারুণিক শ্রীভগবানেরই সদৃশ সমদৃষ্টিযুক্ত এবং সর্ব্বজীব-হিতকারী। পিতার যোগ্য এবং অযোগ্য, অধিক গুণবান্ এবং অল্পগুণবান্, শিশু এবং যুবক, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, ভক্ত এবং অভক্ত, কর্ম্মঠ এবং অলস সকলপ্রকার পুত্রই হইতে পারে; কিন্তু বহুপুত্রবান্ এবং স্নেহময় পিতা যেরূপ ঐ সকল পুত্রের যথাযোগ্য অধিকারানুসারে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়াও আপনার স্নেহদৃষ্টি দ্বারা পুত্ররূপে সকলকে একইপ্রকার দেখেন, সেইরূপ অবিরোধী, অভ্রান্ত, সর্ব্বজীবহিতকারী সনাতনধর্ম্মের কৃপাদৃষ্টি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়, ধর্ম্মপন্থ এবং ধর্ম্মমতসমূহের উপরই রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কাল দুরত্যয়। কালের যে বিভাগে, যেপ্রকার গুণের পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই হইবে। তথাপি কালানুরূপ পুরুষার্থ সাধিত হইলে সৎকর্ম্মের ফলও অবশ্যম্ভাবী হয়। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, ত্রেতাযুগে রজোগুণমিশ্রিত সত্ত্বগুণের আধিক্য, দ্বাপরযুগে তমোমিশ্রিত রজোগুণের বিশেষত্ব, এবং কলিযুগে তমোগুণের প্রভাব তত্তৎ যুগের জীবসমূহের উপর নিপতিত হয়। যদিও জীবক্রমোন্নতিকারী ধর্ম্মের ধর্ম্মত্বরূপ প্রবাহ সকল কালেই সমান রূপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গুণপরিণামের নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রবাহের গম্ভীরতামধ্যে তারতম্য পড়িয়া যায়। নদীতে জলপ্রবাহ সকল স্থানের উপর দিয়া সমান রূপে প্রবাহিত হইলেও যেপ্রকার জলের গভীরতা নদীগর্ভের সকল স্থানে সমান রূপে না থাকায়, মনুষ্য ঐ প্রবাহের সকল স্থানে অবগাহনস্নানের সুখানুভব করিতে পারে না, সেইপ্রকার সকল যুগে এবং সকল কালে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীবহিতকারী ধর্ম্ম সমানরূপে বিদ্যমান থাকিলেও কালপ্রভাবের নিমিত্ত জীবসমূহের অন্তঃকরণে উহার গম্ভীরতার তারতম্য হইয়া থাকে। এই কারণে শাস্ত্রসমূহে আদেশ আছে যে, সত্যযুগে ধর্ম্মের চারি পাদ, ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের তিন পাদ, দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুই পাদ এবং কলিযুগে ধর্ম্মের কেবল একমাত্র পাদ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহা হউক, যে যুগে মনুষ্যদিগের যেরূপ উৎপত্তি এবং তাহাদিগের যে-যে-প্রকার গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহা অবশ্যই হইবে। বর্ত্তমান কালে

আর্য্যজাতিভাবের যে কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহার মূলেও কালধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ফলতঃ তত্ত্বদর্শী এবং কালজ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষদিগের ইহাই সম্মতি যে, দুরত্যয় কালধর্ম্মের কারণেই এ সময়ে আর্য্যজাতির পূর্ণ রীতি ক্রমে উন্নতি, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পূর্ণমর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠা এবং সনাতনধর্ম্মের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হওয়া অসম্ভব। তবে বীজরক্ষা রূপে প্রবলপুরুষার্থ দ্বারা কিছু উন্নতি অবশ্যই হইতে পারিবে।

যেপ্রকারে চারি যুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই প্রকারে আবার প্রত্যেক যুগের অন্তর্গত চারি যুগের অন্তর্ভাব হয়। যেপ্রকার জ্যোতিষবিজ্ঞানানুসারে দশা এবং অন্তর্দ্দশা স্বীকৃত হয়, সেইপ্রকার কালধর্ম্মেও যুগসমূহের পূর্ণ পরিমাণের অন্তর্গত অন্য যুগসমূহের অন্তর্ভাবও স্বীকৃত হয়। যেপ্রকার কৃষকগণ এক ঋতুতে উৎপন্ন শস্যবীজের রক্ষা অতি সাবধানতাপূর্ব্বক অন্যান্য ঋতুতে এই বিচার দ্বারা করিয়া থাকে যে, ভবিষ্যতে যখন উক্ত শস্যের পুনরুৎপত্তি-উপযোগী ঋতুর আবির্ভাব হইবে, তখন সেই সুরক্ষিত বীজ হইতে পুনরায় ঐ শস্যের উৎপত্তি হইতে পারে, সেইপ্রকার এই ঘোর তমঃপ্রধান কলিযুগে অন্যযুগসমূহের অন্তর্ভাব হইবার সময় ধর্ম্ম ও সদ্‌বিদ্যার বীজ রক্ষা হওয়া বিজ্ঞানসিদ্ধ। বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ কালের নিমিত্ত সকল সদ্‌ভাবসমূহের বীজ রক্ষা করাই এক্ষণে শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যদিও সর্ব্বজীবহিতকারী, অনাদিসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব এই সময়ের অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়, ধর্ম্মপন্থ এবং ধর্ম্মমতসমূহ অনুভব করিতে পারে না, যদিও পূর্ণ-বিজ্ঞানযুক্ত সনাতন ধর্ম্মের সকল অঙ্গ এবং উপাঙ্গের বিকাশ এই করাল কলিযুগে সমানরূপে সর্ব্বত্র হওয়া অসম্ভব, যদ্যপি কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্য এবং শিষ্যবর্গের মধ্যে এরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে যে, যাহার দ্বারা তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের মতসমূহকে প্রায় দ্বেষভাবে দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যদিও এ সময়ে জগতের মধ্য হইতে এরূপ অজ্ঞানের দূর হওয়া সর্ব্বথা সম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় না, তথাপি সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বলোকহিতকর মহান্ ভাব এবং উহার যাবৎ অঙ্গ এবং উপাঙ্গসমূহের প্রকাশ এবং উহার সর্ব্বজীবোপকারিতা জ্ঞান বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী পুস্তকাদির দ্বারা বীজরক্ষারূপে স্থায়ী করা কর্ত্তব্য।

ইহা সম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় না যে, এ সময়ে যে চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমে বিকার উৎপন্ন হইয়া অগণিত বর্ণ এবং অগণিত আশ্রমসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগের যথারীতি সংস্কার হইয়া বেদোক্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে ; ইহা সম্ভব নহে যে, সাত্ত্বিক প্রেমের উৎপত্তি হইয়া সকল প্রকারের ব্রাহ্মণগণ ঐক্য সংস্থাপনপূর্ব্বক সমষ্টিরূপে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন, ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব যে, বেদোক্ত সর্ব্বমান্য সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ণ মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়া বর্ণাশ্রমভ্রষ্টকারী কৌপীনধারী সাধুসমাজের সংস্কার হইতে পারিবে, ইহাও অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতেছে যে, যখন বহুসংখ্যক হীনবর্ণ অনুশাসনাভাব বশতঃ প্রমাদগ্রস্ত হইয়া উচ্চবর্ণে পরিণত হইতেছে, এবং যখন সকল বর্ণ এবং তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাসমূহ স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে উন্মত্ত হইয়া অন্যবর্ণসমূহকে উপেক্ষাপূর্ব্বক আপন আপন মহত্ত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছে, এইরূপ সময়ে বর্ণ এবং আশ্রমসমূহ পুনরায় নিয়মবদ্ধ হইতে পারে—তথাপি বীজরক্ষারূপে সকলের মধ্যে আদর্শ ভাবের রক্ষা হইতে পারে।

যখন দেখা যাইতেছে যে, সকল মহর্ষি দ্বারা সমভাবে সুরক্ষিত হইয়াও বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এবং সৌররূপী সগুণ উপাসক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে এবং সগুণ উপাসনার পক্ষপাতী ও ব্রহ্ম-উপাসনার পক্ষপাতী আচার্য্যদিগের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ করাই উঁহারা এখন সাধনাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত করিয়া ফেলিয়াছেন, যখন লক্ষ্য বস্তু একই হইলেও এবং সকল সম্প্রদায় বেদানুকূল হইলেও সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম না হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মহানিকর দ্বেষবুদ্ধির উৎপত্তি হইতেছে, যখন বৈদিক অধিকার স্বীকারকারী এবং বেদপ্রামাণ্য ও ঋষিবাক্য-শিরোধার্য্যকারী বর্ণাশ্রমী এবং সাম্প্রদায়িক মনুষ্যদিগের মধ্যেই আপনাদিগের স্বরূপজ্ঞান নাই, তখন কিরূপে আশা করা যাইতে পারে যে, সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বকল্যাণপ্রদ রূপের পূর্ণ বিকাশ এ সময়ে আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে হইতে পারিবে ? সদাচারী বৈদিক সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যখন প্রেমের প্রভাব সর্ব্বথা বিদ্যমান আছে, তখন তাঁহাদিগের প্রেম অবৈদিক, আচারহীন অন্যধর্ম্মমতসমূহের সহিত স্থাপিত হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। তথাপি

পূর্ব্বকথিত সনাতনধর্ম্মের মহান্ স্বরূপ যখন শিক্ষিতব্যক্তিসমূহের মধ্যে প্রকাশিত করা যাইবে, তখন পবিত্র ভাবসমূহের বীজরক্ষারূপে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বলোকহিতকর যথার্থ স্বরূপের কিয়ৎ পরিমাণে মহত্ত্বজ্ঞান অবশ্যই আবির্ভাব হইবে।

অন্য ধর্ম্মপন্থসমূহ অথবা মতসমূহের ন্যায় সনাতন ধর্ম্ম কৃত্রিম নহে; ইহা স্বভাবসিদ্ধ, পূর্ণ এবং অকৃত্রিম। অতএব বর্ত্তমান সময়ে যে সনাতন ধর্ম্মের সহিত রাগদ্বেষের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, সনাতন ধর্ম্মের নামের সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ স্তুতি, নিন্দা, ঈর্ষা, প্রমাদ, খণ্ডন, নিগ্রহ, বাচালতা, দম্ভ, দোষদৃষ্টি, প্রেমরাহিত্য, বিতণ্ডা এবং জল্প-আদি বৃত্তিসমূহ তাহাদিগের আচার্য্য, উপদেশক এবং সাধকদিগের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বলোকহিতকর সনাতন ধর্ম্মের বৃত্তি নহে। যথাধিকার উপদেশ প্রদান করা, কর্ম্মসঙ্গীদিগের বুদ্ধিভেদ না করা, জ্ঞান, উপাসনা এবং কর্ম্মের যথাযোগ্য অধিকারীদিগকে তত্তৎ অধিকারানুসারে সাধন বিষয়ে তৎপর করা, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র অধিকারের ধর্ম্মমত হইলেও তাহাদিগকেও তাহাদিগেরই রীতি অনুসারে আত্মোন্নতি করিতে বাধা না দেওয়া, সদাচারের পূর্ণবিচার থাকিলেও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়, ধর্ম্মপন্থ এবং ধর্ম্মমতসমূহের সহিত প্রেম স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ না হওয়া, এবং অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত ত্রিবিধ বিজ্ঞানযুক্ত ধর্ম্মরহস্যজ্ঞাতা হইলেও ধর্ম্মাধিকারে অতি বালক অধিকারীকেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দর্শন না করা, ইত্যাদি সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্বপ্রতিপাদক বৃত্তি।

বর্ত্তমান সময়ের বহির্দৃষ্টির জন্যই বিদ্যার যথার্থ স্বরূপ সংসার হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; পদার্থসম্বন্ধীয় বিচার এবং সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধিকেও লোকে বিদ্যা বলিয়া মনে করে। অতএব বিদ্যার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান বীজরূপে প্রকাশিত করা উচিত। অবিদ্যানাশকারিণী, জ্ঞানজননীকে বিদ্যা বলা যায়। শিক্ষার প্রণালীর সহিত বিদ্যার এই লক্ষণের সংস্কার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিবার যত্ন সর্ব্বদা করা উচিত। বীজকে জীবিত রাখিলে কালান্তরে অবশ্যই অঙ্কুরোৎপত্তি হইবে। আর্য্যজাতির প্রাচীন পুস্তকসমূহ যাহা লুপ্ত হইয়াছে, উহার উদ্ধার করিবার জন্য প্রবল যত্ন রাখা কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, শিল্প ও কলাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা (সায়েন্স)-আদির অংশ যাহা আমাদের লুপ্ত

হইয়াছে এবং যাহা অন্য জাতিমধ্যে পাওয়া যায়, অতি যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদয় সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত উপলব্ধ হইতে পারে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ করিয়া উহার সুরক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত, অপ্রকাশিত এবং লুপ্ত গ্রন্থসমূহের সূচী নির্ম্মাণ করিয়া পুস্তক সুরক্ষার যথাসম্ভব চেষ্টা পরম কর্ত্তব্য।

পূর্ণজ্ঞানযুক্ত বৈদিক বিজ্ঞানের ভিত্তি অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত ভাবত্রয়ের উপর অবস্থিত। পরমপিতা, অনন্তশায়ী, অনন্তদেবের ভাব অনন্ত এবং সেই পরমাত্মা অনন্ত লীলাময়; এই জন্য অনন্তশক্তিশালিনী মাতাকেও অনন্ত বৈচিত্র্য দ্বারা পরিপূর্ণ রূপসমূহ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। পিতা প্রধানতঃ অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূতরূপী ভাবত্রয়ে নিমগ্ন আছেন, ফলতঃ মাতৃদেবীকেও সাধারণতঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপী গুণত্রয়ের বিকাশ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কার্য্য করিতে করিতে পিতৃদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সেবায় সদাই উপস্থিত থাকিতে হয়। এই বৈজ্ঞানিক রহস্যানুসারে পরমাত্মার ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং বিরাট্ স্বরূপের বর্ণন শাস্ত্রসমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাক্য এবং মনের অগোচর, সর্ব্বকারণ, আদি এবং অন্তরহিত, সৃষ্টির অতীত যে সচ্চিদানন্দ ভাব আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়াছে। তাহাই অধ্যাত্ম ভাব। জগৎ-জন্মাদির কারণ, সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, কৃপাময়, জগদ্গুরু এবং গুণত্রয়ের আধাররূপী যে ভাব, তাহাই ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই অধিদৈব ভাব। এবং কার্য্যব্রহ্মরূপী এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংযুক্ত যে স্থূল ভাব, তাহাই বিরাট্ পুরুষ নামে কথিত হয়। ইহাই ভগবানের অধিভূত ভাব। *

* যত্তদ্‌ব্রহ্ম মনোবাচামগোচরমিতীরিতম্।
তং সর্ব্বকারণং বিদ্ধি সর্ব্বাধ্যাত্মিকমিত্যপি ॥
অনাদ্যং তমজং দিব্যমজরং ধ্রুবমব্যয়ম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সংপ্রবর্ত্ততে ॥
স্বেচ্ছামায়াখ্যয়া যত্তজ্জগজ্জন্মাদিকারণম্।
ঈশ্বরাখ্যং তু তত্তত্ত্বমধিদৈবমিতি স্মৃতম্ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সদ্‌গুরুর্নিত্যোঽন্তর্যামী কৃপানিধিঃ।
সর্ব্বসদ্‌গুণসারাত্মা দোষশূন্যঃ পরঃ পুমান্ ॥

বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে কথিত "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রের রহস্য সম্বন্ধ, শ্রীভগবানের এই ভাবত্রয়ের সহিত রহিয়াছে; এই মন্ত্রের তিন পদের সহিত যথাক্রমে এই তিন স্বরূপের সম্বন্ধ আছে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এইরূপ অনুভব করেন। * এই নিমিত্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রে এই মন্ত্রের এরূপ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সৃষ্টির আদি কারণ শ্রীভগবান্ যখন ভাবত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছেন, তখন সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গ কেন ঐ তিন ভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না? যাহা হউক, বৈদিক বিজ্ঞানানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গ এবং এই সৃষ্টির সকল পদার্থ যে ভাবত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত. ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণস্থলে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিচার করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে যে, অধ্যাত্ম নেত্র রূপতন্মাত্রা, অধিদৈব নেত্র সূর্য্যদেব, এবং অধিভূত নেত্র এই স্থূল নেত্রের

যৎ কার্য্যব্রহ্ম বিশ্বস্য বিধানং প্রাকৃতাত্মকম্।
বিরাডাখ্যং স্থূলতরমধিভূতং তদুচ্যতে॥
যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ॥

(ইতি পূজ্যপাদ মহর্ষি বশিষ্ঠ।)

* ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ইত্যাদি।

(শ্রীগীতোপনিষৎ।)

গোলক। * এইপ্রকার সকল পদার্থ এবং সকল বিষয় সনাতনধর্ম্মোক্ত বিজ্ঞানানুসারে ত্রিভাবাত্মক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বেদের মহত্ত্বও এই কারণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহার অপৌরুষেয় হইবার কারণ এই যে, উহার প্রত্যেক শ্রুতিই ত্রিভাবাত্মক। † এবং কাণ্ডত্রয়ের অনুসারে সমষ্টিরূপী বেদও ত্রিভাবাত্মক। সাধকের মধ্যে যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বৃদ্ধি হইবে, তিনি ততই সকল অবস্থা এবং সকল বস্তুর মধ্যে এই ভাবত্রয়ের অনুভব অধিকরূপে করিতে সমর্থ হইবেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পূর্ণতা, দার্শনিক শিক্ষা ও অন্তঃ-করণের পবিত্রতা হইতে হইয়া থাকে। আত্মসাক্ষাৎকারলাভ এই দৃষ্টির চরম সীমা। প্রত্যেক শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যের মধ্যে ভাবশুদ্ধি রক্ষা করা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান হেতু। ভাবশুদ্ধির দ্বারা অসৎ কার্য্যও ধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত হইতে পারে; ভাবশুদ্ধির দ্বারা সামান্য কর্ম্ম হইতে অসামান্য ফল লাভ হইতে পারে; এবং ভাবশুদ্ধি করিতে এবং করাইতে হইলে, পূর্ব্বকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সর্ব্বোপরি আবশ্যকতা আছে। সুতরাং শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা উক্ত ভাবত্রয়ের সংস্কারের বীজরক্ষা হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিশ্বজননী মহামায়ার রূপ ত্রিগুণময়। তাঁহার সৃষ্টিলীলার কোন অংশই গুণত্রয়রহিত নহে। তিন গুণের বিষয়ে শাস্ত্রসমূহে বর্ণনা আছে ‡ যে, নির্ম্মল

---

* ঈশস্য মায়াগুণমপ্যনেকধা, বিকল্পবুদ্ধিশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক-মথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ ॥
দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে, পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ স্বয়াঽনুভূত্যাঽখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥
(ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে।)

† যথা দুগ্ধঞ্চ তণ্ডুলঞ্চ শর্করা চ সুমিশ্রিতম্।
কল্পিতং দেবভোগায় পরমান্নং সুধোপমম্ ॥
তথা ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ শ্রুতিভেদঃ সুখাত্মকঃ।
নয়তে ব্রাহ্মণান্নিত্যং ব্রহ্মানন্দং পরাৎপরং ॥
(ইতি বিজ্ঞানভাষ্যে।)

‡ তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

হওয়ায় প্রকাশক এবং অনাময় (শান্ত) সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসঙ্গ দ্বারা এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করিয়া থাকে। রজোগুণ রাগাত্মক এবং তৃষ্ণা (অভিলাষ) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রজোগুণ দেহধারীকে কর্ম্মসমূহের অনুরাগের দ্বারা বন্ধন করিয়া দেয়। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহা অসাবধানতা, উদ্যমহীনতা এবং চিত্তের খিন্নতার দ্বারা দেহীদিগকে বন্ধনযুক্ত করিয়া থাকে। প্রধানতঃ সত্ত্বগুণ জ্ঞানাধিকতা, রজোগুণ ইচ্ছা এবং ক্রিয়ার অধিকতা, এবং তমোগুণ অজ্ঞান এবং প্রমাদের অধিকতা হইতে জানিতে পারা যায়। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থের সহিত গুণ-ত্রয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় এই সংসারের সমস্ত পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই কারণে বৈদিক বিজ্ঞানানুসারে মনুষ্যের মধ্যে তিনপ্রকার অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে, এবং এই কারণে ধর্ম্মের সকল অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং অধিকার ত্রিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীগীতাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহের মধ্যে ত্রিবিধ বুদ্ধি, ত্রিবিধ সুখ, ত্রিবিধ কর্ত্তা, ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ উপাসক, ত্রিবিধ উপাসনা, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, ত্রিবিধ জ্ঞান, ত্রিবিধ ত্যাগ, ত্রিবিধ যজ্ঞ, ত্রিবিধ ধৃতি, ত্রিবিধ তপ, ত্রিবিধ দান, ত্রিবিধ আহার, ত্রিবিধ শ্রোতা, ত্রিবিধ মননকর্ত্তা, ত্রিবিধ নিদিধ্যাসক প্রভৃ-তির বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে বেদসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানাংশ, গাথাংশ এবং অনুশাসনাংশের পার্থক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এই কারণে পুরা-ণাদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সমাধিভাষা, লৌকিক ভাষা এবং পরকীয় ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া ত্রিবিধ অধিকারীর কল্যাণ সাধন করা হইয়াছে। *

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

(ইতি শ্রীগীতোপনিষৎ।)

* সমাধিভাষা প্রথমা লৌকিকীতি তথা পরা।
তৃতীয়া পরকীয়েতি শাস্ত্রভাষা ত্রিধা স্মৃতা॥
গুপ্তমেতদ্ রহস্যং বৈ ভাষাতত্ত্বং মহর্ষয়ঃ।
সম্যক্ জ্ঞাত্বা প্রবর্ত্তধ্বং শাস্ত্রপাঠেষু সংযতাঃ॥

এই পূর্ব্বকথিত ভাবত্রয় এবং গুণত্রয়বিজ্ঞান বৈদিক সিদ্ধান্তের মূলভিত্তি। যাহা হউক, আর্য্য-সদাচার এবং আর্য্য-শিক্ষার মধ্যে ইহার বীজরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পদার্থ বিদ্যা (science) ই বর্ত্তমান সময়ে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার দ্বারা নানাপ্রকার স্থলযান, জলযান এবং নভোযানের সৃষ্টি, তাড়িত শক্তির আবিষ্কার দ্বারা ক্রিয়া এবং জ্যোতি সম্বন্ধীয় বহুপ্রকার অলৌকিক কার্য্য সিদ্ধি, অসাধারণ অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন-আদি শাস্ত্রের অদ্ভুত উন্নতি, এই সকল পদার্থবিদ্যার উন্নতি দেখিয়া এ সময় অনেকে বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান দেশ কাল পাত্রের বিচার করিলে বিস্ময়ান্বিত হইবার কারণ কিছু নাই। ভগবৎশক্তিপ্রাপ্ত মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছিল, তখন আর্য্যজাতি দ্বারা অন্তর্জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তখন আর্য্যদিগের জ্ঞানশক্তি তাঁহাদিগের দৈবী প্রকৃতি অনুসারে যেদিকে নিয়োজিত হইয়াছিল, ঐ দিকেই অলৌকিক ফলপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এখন তমঃপ্রধান কলিযুগে মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের আসুরী প্রকৃতির অনুযায়ী স্থূলরাজ্যে নানা অলৌকিক উন্নতি সাধিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! প্রকৃত পক্ষে পদার্থবিদ্যোন্নতির এখন কেবল প্রথমাবস্থা বলিতে হইবে; ভবিষ্যতে পদার্থবিদ্যার আচার্য্যগণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত আরও অলৌকিক ও বিস্ময়কর অনেক উন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্যজাতিকে ঐ সকল উন্নতিতে বিচলিত না হইয়া বরং

সমাধিভাষা জীবানাং যোগবুদ্ধিপ্রদীপিকা।
নয়তে নিতরামেতান্ পরমামৃতমব্যয়ম্ ॥
সুরম্যা লৌকিকী ভাষা লোকবুদ্ধিপ্রসাধিকা।
পরমানন্দভোগান্ সা প্রদত্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পরকীয়া তথা ভাষা শাস্ত্রোক্তা পাপনাশিনী।
জীবান্ সা পুণ্যলোকানাং কুরুতে হ্যধিকারিণঃ ॥

(ইতি পূজ্যপাদ মহর্ষি ভরদ্বাজ।)

আপনাদের প্রয়োজনোপযোগী ঐ সকল নূতন আবিষ্কৃত পদার্থবিদ্যার সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভ্রান্ত বিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ যাহাতে লক্ষ্যচ্যুত না হয়, তাহা করিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ত্রিভাবাত্মক শক্তিবিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদের ত্রিগুণময় বিজ্ঞানাদি যেন ঐ সকল বিদ্যার নূতন আবিষ্কারের সহিত লক্ষ্যচ্যুত না হয়, তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার সারসংগ্রহ করিতে হইলে নবাবিষ্কৃত শাস্ত্রসমূহ আপনাদের দেশকালপাত্রানুযায়ী করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়া সিদ্ধাংশে পরিণত করিবার সময় বৈদিক অভ্রান্ত বিজ্ঞান সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কর্ম্মোপযোগী করিতে হইবে। এবং সর্ব্বদা ইহা স্থির লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অন্তর্দৃষ্টিশূন্য নবীনাবিষ্কৃত পদার্থবিদ্যা সকল আর্য্যজাতিকে অধ্যাত্মলক্ষ্যচ্যুত না করিতে পারে।

কর্ম্মই সৃষ্টির আদি কারণ। এই নিমিত্ত বেদসমূহের মধ্যে কর্ম্মবিজ্ঞানের আধিক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না যে, কোন্ বৈদিক কর্ম্মের কি তাৎপর্য্য আছে, তথাপি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, প্রত্যেক বেদোক্ত কর্ম্ম বিজ্ঞানমূলক এবং নিত্যসত্যফলপ্রদ। যদিও সংহিতা এবং ব্রাহ্মণাদি বৈদিক বিভাগসমূহের সহস্রাংশও এক্ষণে উপলব্ধ হয় না, যদিও স্মার্ত্ত আচার, পৌরাণিক আচার এবং তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডই ভারতভূমিতে বৈদিক আচার এবং কর্ম্মকাণ্ডের স্থান প্রায় অধিকার করিয়া লইয়াছে, তথাপি উক্ত আচার ও কর্ম্মকাণ্ড বেদমূলক হওয়ায় এবং অপৌরুষের বেদের অধিকার সর্ব্বোপরি থাকায়, দেশকালপাত্রানুসারে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে বীজরক্ষারূপে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সকল অঙ্গের ক্রিয়া-সিদ্ধাংশের রক্ষা করা সর্ব্বথা হিতকারী। বৈদিক শিক্ষার বিস্তার, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়াসিদ্ধাংশের প্রণালীর প্রচার এবং সকল প্রান্তের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডীদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিলে ফলসিদ্ধি হইতে পারিবে।

জগদীশ্বরের নিত্যশক্তিসমূহের বিভাগানুসারে ঋষি, দেবতা এবং পিতৃ তাঁহার সাক্ষাৎ বিভূতি। বেদসমূহে প্রকারান্তরে ইঁহাদিগের পূজার বর্ণন বহু প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্ত্বদর্শী মুনিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, এই তিন ঈশ্বরাংশের পূজা যে জাতির মধ্যে যত অধিক আছে, সেই জাতি ততই উন্নত হইয়া

থাকে, এবং ইঁহাদিগের পূজা লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জাতিসমূহ নষ্ট এবং ভ্রষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য বিভাগে যে অন্যান্য উন্নত জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের মধ্যে কি ঋষি, দেবতা এবং পিতৃপূজা প্রচলিত আছে? ইহার সিদ্ধান্ত করিবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিতে পারেন যে, ঐ সকল জাতিমধ্যে বৈদিক বিজ্ঞান এবং আচারের প্রচার নাই, তথাপি কার্য্যতঃ ঐ সকল জাতি অবশ্যই বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে বহু পরিমাণে এরূপ ধর্ম্মকার্য্য করেন যে, তাহার দ্বারা তাঁহাদিরের জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মশক্তি ব্যাপক। অতএব তাহার কোন অঙ্গমাত্র পালন করিলেও ফলোৎপত্তি বিষয়ে বিফলতা হয় না। ধর্ম্ম সত্যরূপ। অতএব রহস্যজ্ঞান হউক অথবা নাই হউক, তাহার সাধন দ্বারা অবশ্য পূর্ণ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যদিও ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের অধিবাসীদিগের পরমাত্মার অধ্যাত্মতত্ত্ব-বোধ নাই, যদিও তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মহর্ষিদিগের সত্তা অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের প্রীতিকর এরূপ অনেক কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তাহার দ্বারা আপনা আপনিই তাঁহারা ঋষিপূজার ফলাধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিদ্যানুরাগ, নিত্য জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা, নিয়মিত শাস্ত্রাভ্যাসের প্রবৃত্তি, বিদ্যা এবং বিদ্বান্‌দিগের উপর শ্রদ্ধা ইত্যাদি অনেক এপ্রকার ধর্ম্মবৃত্তি তাহাদিগের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে যে, তাহার দ্বারা তাঁহারা স্বতই ঋষিদিগের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই প্রকারে যদিও তাঁহারা বেদোক্ত অধিদৈব বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যদিও নিত্যসিদ্ধ দেবদেবীদিগের প্রতি তাঁহাদিগের কিছুই শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু স্বার্থত্যাগ, দান, তপ, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, পুরুষার্থ, ঔদার্য্য, ভগবদ্ভক্তি-আদি ধর্ম্মসাধন দ্বারা তাঁহারা দেবতাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিবার জন্য স্বতই সমর্থ হইয়া থাকেন। উক্ত দেশবাসীদিগের অতি প্রশংসনীয় গুরুজনসম্মান-বুদ্ধি, পিতৃমাতৃসেবার অসাধারণ প্রবৃত্তি, * তাঁহাদিগের বৃদ্ধসেবায় রুচি, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে

* জাপান জাতির মধ্যে এ সময় পরলোকগামী পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাপানদেশে যে পুত্র মাতাপিতাকে ভোজনাদির দ্বারা সেবা না করে,

আপনাদিগের পূর্ব্বজদিগের কীর্ত্তি এবং সম্মান রক্ষা করিবার প্রবল ইচ্ছাদি ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের দ্বারা তাঁহারা পিতৃযজ্ঞ সাধন ব্যতীত পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়া থাকেন। সুতরাং যে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোমকূপে পিতৃপূজা, দেবপূজা এবং ঋষিপূজার সংস্কার আদিকাল হইতে অঙ্কিত আছে, সে স্থানে এই পরমধর্ম্মের বীজ রক্ষা হওয়া সর্ব্বদা কল্যাণপ্রদ এবং সঙ্গে সঙ্গে এই পবিত্র এবং আদিজাতির মধ্যে যে সকল ঋষি, মুনি, সাধু, মহাত্মা আদর্শরূপ হইয়াছেন, যে সকল সদ্‌গৃহস্থ অথবা নরপতিবৃন্দের মধ্যে এরূপ দানবীর, যুদ্ধ-বীর অথবা কর্ম্মবীর হইয়া গিয়াছেন যে, যাঁহাদিগের জীবনী আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে, এরূপ মহাপুরুষদিগের মহিমা চিরস্থায়ী রূপে রক্ষা করিয়া এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান রাখিয়া জাতিকে শিক্ষাদান করা উচিত। বীজরক্ষা-কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের কোনও প্রান্তে এরূপ এক আদর্শ প্রদেশ স্থায়ী রাখা কর্ত্তব্য, যে স্থানে শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, সতীত্বধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ-ক্ষাত্রানুশাসন, ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ মর্য্যাদা এবং সদাচার-সমূহের পালন করিবার এবং করাইবার সম্পূর্ণ সুবিধাপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

সনাতনধর্ম্মানুসারে সদাচার পালন করাই প্রথম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মজ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা অধ্যাত্মশুদ্ধি, ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধির দ্বারা অধিদৈব-শুদ্ধি এবং সদাচারপালন দ্বারা অধিভূতশুদ্ধি হইয়া থাকে। শরীরের সহিত অধিভূত সম্বন্ধের প্রাধান্য আছে, এই নিমিত্ত আচারই প্রথম ধর্ম্ম, এই কারণে আচারের প্রধানাবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই আচার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই, যে ব্রাহ্মণজাতি অনাদিকাল হইতে জগদ্‌গুরু বলিয়া বিবেচিত হইয়া-ছিলেন, সেই জাতি আজকাল প্রায়ই পাচকের জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সদাচার পরিত্যাগের কারণেই, যে জাতির অনুশাসনাধীন হইয়া ভুবনবিজয়ী ক্ষত্রিয় সম্রাট্‌গণ পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, সেই জাতি আজ

তাহাকে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত রাজাজ্ঞা অবধারিত আছে। ঐ দেশে জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধের সম্মান না করিলেও উচিত রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই কারণে জাপান উন্নত হইয়াছে।

প্রায়ই শূদ্রসেবা এবং "হন্তকারী"র * রুটির দ্বারা আপনাদের উদর পূরণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করেন। যে জাতির অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত শুদ্ধির নিমিত্তই কেবল সেই জাতির মধ্যে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে ভ্রমণকারী ব্যক্তি আজ ইহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া থাকেন যে, আচার-ভ্রষ্টতার নিমিত্ত সেই জাতির মধ্যে কেহ বা একেবারেই শূদ্রবৎ হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ বা ক্রমে বর্ণসঙ্কর হইয়া নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, এক সময় এই পবিত্র ভারতভূমির সকল স্থান তপস্যা ও স্বাধ্যায়-নিরত এবং পরোপকার-ব্রতধারী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে আচার-ত্যাগের নিমিত্তই গ্রাম, নগর, জনপদ অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিয়া গেলেও যথার্থ লক্ষণযুক্ত আদর্শচরিত্র ব্রাহ্মণের দর্শনলাভ হয় না। এই আচার-ভ্রষ্টতার নিমিত্তই এক সময়ে যে ক্ষত্রিয়জাতি আপনাদিগের ঔদার্য্য, শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশভক্তি, পরাক্রম, নির্লোভতা, অহিংসাবৃত্তি, অক্রোধ, সত্য এবং দানবৃত্তির নিমিত্ত জগদ্বিজয়ী ছিলেন, আজ সেই জাতির মধ্যে উক্ত সদ্গুণাবলীর নামমাত্রও নাই, পক্ষান্তরে উক্ত জাতির বংশধরগণকে প্রায়ই লোভী, অনুদার, ভীরু, চঞ্চল, কদাচারী, ধর্ম্মবুদ্ধিহীন, স্বার্থপর, অলস, হিংস্র, সত্যভ্রষ্ট, তপস্তেজোহীন, কৃপণ এবং নির্ব্বীর্য্য দেখা যায়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, বহিরাচারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদিগের প্রমাদই ইহার কারণ। যাহা হউক, দূরদর্শী মুনিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যদিও কালমাহাত্ম্যের জন্য, দেশকালপাত্রের আবশ্যকতানুসারে এবং আপদ্কাল বিবেচনা করিয়া চারিবর্ণের আচারসমূহের মধ্যে ন্যূনাধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এরূপ যত্ন হওয়া অবশ্য উচিত যে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণের সদাচার-সম্পন্ন আদর্শজীবনের বংশ স্থানে স্থানে স্থায়ী থাকে। সাধারণতঃ এই বিষয়ে

* উত্তরপশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় সদ্গৃহস্থদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, প্রতিদিন তাঁহাদিগের গৃহে যে রুটি প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে একখানি অথবা দুইখানি রুটি গৃহস্থের পাপক্ষয় সংকল্পে তাঁহারা রাখিয়া দেন এবং সেই রুটি তাঁহাদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণের স্ত্রী অথবা কন্যাগণ লইয়া যান; উহাকে হন্তকারী বলে।

অবশ্যই মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করা কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মণসমাজে তপস্যা, ত্যাগ এবং নিষ্কাম পুরুষার্থপ্রবৃত্তি জীবিত থাকে, এবং ক্ষত্রিয়সমাজে স্বদেশানুরাগ, শৌর্য্য এবং ক্ষাত্রধর্ম্মাচার বিষয়ে প্রবল ইচ্ছা দিন দিন উন্নতিপ্রাপ্ত হয়। এই উভয় বর্ণগত আদর্শজীবনের বীজরক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই উভয়ের সম্বন্ধযুক্ত দুই প্রকারের শরীরত্যাগের প্রশংসনীয় প্রণালীর সংস্কার উভয়ের মধ্যে প্রচলিত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর্য্যজাতির নিকটে যোগযুক্ত হইয়া সমাধিদশায় শরীর ত্যাগ করা এবং ধর্ম্মযুক্ত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে শরীর ত্যাগ করা, এই দুই প্রকারের শরীরত্যাগের প্রণালী নিঃশ্রেয়সকর এবং অভ্যুদয়কর। এই দুইপ্রকার শরীর-ত্যাগের সংস্কারের বীজরক্ষা করা সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাস আশ্রম সকল আশ্রমের গুরুস্থানীয়। ঐ আশ্রমের বিকার এবং শুদ্ধির সহিত অন্য বর্ণ এবং আশ্রমসমূহের অবনতি এবং উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব এই চতুর্থ-আশ্রমধর্ম্মের বীজ রক্ষা করা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এই আশ্রমের উপর অন্য কাহারও আধিপত্য নাই, সন্ন্যাসাশ্রম স্বাধীন এবং প্রবল। এই কারণে এই আশ্রমধর্ম্মের বীজরক্ষার নিমিত্ত উক্ত আশ্রমের নেতৃগণের দ্বারাই সফলতা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শিবাবতার শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভু আর্য্যজাতি এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুরক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষের চারি দিকে যে চারি পীঠ স্থাপন করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদার সুরক্ষার্থ উক্ত চারি পীঠাধীশ সন্ন্যাসী আচার্য্য প্রভুদিগের উপর ঐ চারি প্রদেশের সুশাসনভার ন্যস্ত করিয়াছেন, * ঐ

* সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-মহারাষ্ট্রাস্তথান্তরা।
দেশাঃ পশ্চিমদিকস্থা যে শারদাপীঠসাৎকৃতাঃ॥
আন্ধ্র-দ্রাবিড়-কর্ণাট-কেরলাদিপ্রভেদতঃ।
শৃঙ্গের্য্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচীদিগবস্থিতাঃ॥
কুরু-কাশ্মীর-কাম্বোজ-পাঞ্চালাদিবিভাগতঃ।
জ্যোতির্ম্মঠবশা দেশা হ্যুদীচীদিগবস্থিতাঃ॥
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্ব্বরাঃ।
গোবর্দ্ধনমঠাধীনা দেশাঃ প্রাচীব্যবস্থিতাঃ॥

ইতি শ্রীমঠাম্নায়ে।

প্রথা অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সময় ঐ ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া লইলে আপনাদিগের লক্ষ্যসিদ্ধি হইতে পারে। উক্ত চারি পীঠের মধ্যে একটী পীঠ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। উহার পুনরুদ্ধার করিয়া চারিটী পীঠের আচার্য্য প্রভুদিগের মধ্যে ঐক্য-সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া তাঁহাদিগের চারিজনের সহায়তায় সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধীয় অন্য উপপীঠসমূহকে মর্য্যাদা-পালনে তৎপর করান কর্ত্তব্য। উক্ত চারি পীঠের চারিজন প্রতিনিধির স্থান শ্রীকাশীপুরীর ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রম-প্রধান তীর্থসমূহে স্থাপন করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুকূল যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের বীজরক্ষা এবং তাহার মর্য্যাদা-পালনে যত্ন করান কর্ত্তব্য। কুসঙ্গ, কুশিক্ষা এবং আচারভ্রষ্টতার নিমিত্ত দ্বিজগণের বহু বংশ বর্ণসঙ্কর, কর্ম্মহীন এবং কুলাচারত্যাগী হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণকে কোন কোন স্থলে দ্বিজ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। এই আপদ্দশায় তাঁহাদিগের রক্ষা করিবার ইহাই প্রধান উপায় হইতে পারে যে, সদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক স্বতন্ত্র সমাজ গঠনপূর্ব্বক দ্বিজধর্ম্মের বীজরক্ষা করুন। এবং সদাচার-ত্যাগী বংশসমূহের সহিত বিবাহসম্বন্ধ না রাখিয়া আপন আপন বর্ণসমূহের বীজরক্ষা করুন। এইরূপ হইলে গুণের পূজা স্বতই সমাজমধ্যে প্রচলিত হইবে, এবং এইরূপ সদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য কুলীন নামে অভিহিত হইতে থাকিবেন। ইহাতে আচারের মর্য্যাদাও প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এবং জন্মগত বর্ণ-সংস্কারও জীবিত থাকিবে।

সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমের তপস্যা-বৃদ্ধির নিমিত্ত তীর্থসেবা পরম কল্যাণকারী। কালধর্ম্ম এবং বিশেষতঃ আর্য্যজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থসমূহের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তীর্থসমূহের মর্য্যাদা রক্ষা, তাহাদিগের সংস্কার এবং তীর্থবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তার করাইবার প্রতি সর্ব্বদা যত্ন রাখা উচিত। এবং আদর্শজীবন ব্রাহ্মণ যাহাতে তীর্থে বাস করেন, তৎপ্রতি যত্ন হওয়া উচিত। ধর্ম্মালয়, ধর্ম্মস্থান এবং তীর্থাদির সংস্কার ব্যতীত ধর্ম্মসংস্কারের বীজরক্ষা স্থায়ী ভাবে হইতে পারিবে না। সুতরাং ঐ সকলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আর্য্যজাতির সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত এ জাতির পুরুষদিগের মধ্যে বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের বীজরক্ষা হইবে এবং নারীদিগের মধ্যে সতীত্ব-

ধর্ম্মের বীজরক্ষা হইবে, সে পর্য্যন্ত শত সহস্র বিপ্লব হইলেও এ জাতির নাশ কেহই করিতে পারিবে না। সম্প্রতি কেবল সাতশত বৎসর হইতে এ জাতি পরাধীনতারূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছে; যে অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী জাতির অস্তিত্ব লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে রহিয়াছে, তাহার পক্ষে এ ক্ষণভঙ্গুর ক্লেশ মশকদংশন-সদৃশ তুচ্ছই মনে হওয়া উচিত। ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং সতীত্ব-ধর্ম্মের বীজরক্ষা হইলে কালের অপরিহার্য্য পরিণামে আবার এই অনাদি-কালস্থায়ী জাতি নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত যোগচতুষ্টয়ের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ পরম আবশ্যকীয়। * অধ্যাত্ম-তত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শী পূজ্যপাদ

---

* মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব রাজযোগো হঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
ইতি পূজ্যপাদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য॥

কার্য্যং যত্র বিভাব্যতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকম্,
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতঃ শব্দাত্মী সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চৈব তথাদিমাকৃতিবিশেষত্বাদভূৎ স্পন্দিনী,
শব্দশ্চাবিরভূত্তদা প্রণব ইত্যোঙ্কাররূপঃ শিবঃ॥
সাম্যস্থপ্রকৃতের্গতৈব বিদিতঃ শব্দো মহানোমিতি,
ব্রহ্মাদিত্রিতয়াত্মকস্য পরমং রূপং শিবং ব্রহ্মণঃ।
বৈষম্যে প্রকৃতেস্তথেব বহুধা শব্দাঃ শ্রুতাঃ কালত-
:স্ত মন্ত্রাঃ সমুপাসনার্থমভবন্ বীজানি নাম্না তথা॥
জগতি ভবতি সৃষ্টিঃ পঞ্চভূতাত্মিকা যৎ,
তদিহ নিখিলসৃষ্টিঃ পঞ্চভাগৈর্বিভক্তা।
শ্রুতিরপি বিধিরূপেণাদিশস্তীহ পঞ্চ
বিবিধবিহিতপূজারীতিভেদান্ প্রমাণম্॥
প্রকৃতিমিহ জনানাং সম্পরীক্ষ্য প্রবৃত্তিম্,
গুরুরিহ যদি দদ্যান্মন্ত্রশিক্ষাং যথাবৎ।
রুচিসমুচিতদেবোপাসনামাদিশেদ্বা,
ব্রজতি লঘু স শিষ্যো মোহপারং মুমুক্ষুঃ॥
আকারো ন হি বিদ্যতে কিমপি বা রূপং পরব্রহ্মণঃ,
রূপং তৎ পরিকল্প্যতে বুধগণৈঃ কিম্বা জগদ্রূপিণঃ।

মহর্ষিগণ জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত অসাধারণ পরিশ্রম দ্বারা যে সাধন-কৌশল প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা কিরূপ নিত্যসত্যফলপ্রদ, তাহা যোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যোগচতুষ্টয়ের সাধনব্যবস্থা এবং তাহার অধিকার-নির্ণয় অপূর্ব্ব বিজ্ঞানযুক্ত। উহার সাধন-বিজ্ঞানসমূহের কিছু রহস্য বলা যাইতেছে। যেখানে কোন কার্য্য হয়, সেখানে কম্পন হইয়া থাকে; যেখানে কম্পন হয়, সেখানে শব্দ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী; অতএব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানযুক্ত সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শব্দের প্রতিশব্দকে মন্ত্র বলা যায়। ঐ সকল মন্ত্রের মধ্য হইতে প্রণবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সহিত আছে। এবং বীজমন্ত্র-সমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতির সূক্ষ্মভাবসমূহের সহিত বিদ্যমান আছে। অধ্যাত্মভাবময় ইষ্টদেবের মূর্ত্তিচিন্তনকে ধ্যান বলা যায়। এই বিশ্ব, নামরূপাত্মক। অতএব মন্ত্রযোগের সাধন, মন্ত্ররূপী নাম এবং ইষ্টধ্যানরূপী রূপের অবলম্বন দ্বারা করা হইয়া থাকে। সগুণ উপাসনার মূলভিত্তি মন্ত্র এবং দেবতা। মন্ত্র এবং ইষ্টরূপের অবলম্বনে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতে করিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা মন্ত্রযোগসাধ্য। এই স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীরেরই

ধ্যায়ন্তি নিজবৃত্তিমার্গচলিতৈর্দেবং পরং রূপিণম্,
মন্ত্রং বা সততং জপদ্ভিরিহ তৈর্মুক্তিঃ পরা লভ্যতে॥

ইতি মন্ত্রযোগসংহিতায়াম্।

শরীরং দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলং সূক্ষ্মং পৃথক্ স্মৃতম্।
স্থূলসাধনমুখ্যন্তু হঠযোগং বুধা বিদুঃ॥
শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষং চ নির্লিপ্তঞ্চ হঠস্যু সপ্তসাধনম্॥
ষট্কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনঃ।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥
অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথাশাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
হঠযোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানং হি লভ্যতে।

। ইতি ঘেরণ্ডাদিসংহিতায়াম্॥

পরিণাম। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল শরীর প্রকৃত পক্ষে একই সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় সুকৌশলপূর্ণ যোগক্রিয়ার দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের উপর আধিপত্য করাকে হঠযোগ বলে। শারীরিক-ক্রিয়া-প্রধান হঠযোগের সাধন দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকে জয় করিতে করিতে অন্তঃকরণের বৃত্তি-সমূহ নিরোধ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি করা হঠযোগসাধ্য ব্যাপার। লয়-যোগের রহস্য কিছু অপূর্ব্ব। সমষ্টি এবং ব্যষ্টিরূপ হইতে এই বিশ্বরূপী ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশরীররূপী এই পিণ্ড একই পদার্থ। এই নিমিত্ত এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-লয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডশরীরে যেরূপ পুরুষভাব, প্রকৃতিশক্তি, ঋষি, দেবতা, পিতৃ, নক্ষত্র, গ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র-আদি বর্ত্তমান আছে, সেইপ্রকার এই পিণ্ডরূপী জীবশরীরেও সেই সকল শক্তি যথাধিকারানুসারে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ডের সম্বন্ধ যথাবৎ অবধারণপূর্ব্বক সূক্ষ্মশক্তিসমূহের সহায়তায় আপনার অধিদৈব শক্তিকে আপনার অধীন করিতে করিতে সৃষ্টির কারণ-রূপিণী কুলকুণ্ডলিনীরূপা প্রকৃতিশক্তিকে পরমপুরুষে লয় করিতে করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহকে জয় করিতে করিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার প্রথাকে লয়যোগ বলা যায়। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ এবং লয়যোগের সাধক আপন আপন অধিকারানুসারে সবিকল্প সমাধির পরা কাষ্ঠায় উপস্থিত

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্থূলপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥
দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডঃ পিণ্ড উচ্যতে॥
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে।
জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥

হইয়া রাজযোগের উচ্চতর অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। রাজযোগের অধিকার সর্ব্বোন্নত। কেবল বিচারশক্তির সহায়তায় অন্তঃকরণের চঞ্চল অবস্থা দূর করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি-ভাব প্রাপ্ত করাকে রাজযোগ বলা যায়। যোগসাধন করিলেই পরমানন্দপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা ইহা দেখা যায় যে, জীবের পঞ্চকোষমধ্যে উদ্ভিদ্ জাতিতে অন্নময় কোষের বিকাশ, স্বেদজ জাতির মধ্যে প্রাণময় কোষের বিকাশ, অণ্ডজ জাতির

শিবে শক্তির্লয়ং যাতি লয়যোগো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
সা শক্তিশ্চালিতা যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
ইতি শিবাদিত্যাদিসংহিতায়াম্॥

মন্ত্রো হঠো লয়ো রাজো যোগোঽয়ং মুক্তিদঃ ক্রমাৎ।
রাজত্বাৎ সর্ব্বযোগানাং রাজযোগ ইতি স্মৃতঃ॥
নাদবিন্দুসহস্রাণি জীবকোটিশতানি চ।
সর্ব্বঞ্চ ভস্ম নির্ভূতং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ॥
অহং ব্রহ্মেতি নিয়তো মোক্ষহেতুর্মহাত্মনাম্।
দৃশ্যন্তে দৃশি রূপাণি গগনং ভাতি নির্মলম্॥
সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং মোক্ষদ্বারবিনির্গতম্।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্॥
"অহমেকমিদং সর্ব্বং" ইতি পশ্যেৎ পরং সুখম্।
দৃশ্যতে যৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ॥
রাজন্তং দীপ্যমানন্তং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
প্রাপয়েদ্দেহিনাং যস্তু রাজযোগঃ স কীর্ত্তিতঃ॥
ইতি বিজ্ঞানভাষ্যে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥
ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদ্।

মধ্যে মনোময় কোষের বিকাশ, জরায়ুজ জাতির জীবমধ্যে বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ, এবং ঐ জরায়ুজ জাতির অন্তর্গত মনুষ্যজাতিতেই আনন্দময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচপ্রকার জীবের মধ্যে উক্ত পাঁচ কোষের যথাক্রম বিকাশের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণেই কেবল মনুষ্যের মধ্যেই আনন্দের লক্ষণ হাস্য বিদ্যমান আছে। আনন্দের অধিকারী মনুষ্য, উন্নত অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যোগসাধন দ্বারা পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। এই যোগসাধনচতুষ্টয় অধিকার-ভেদানুসারে সাধকগণকে উপদেশ করা হইয়া থাকে। এই চারিটী মার্গ সনাতনধর্ম্মোক্ত উপাসনাকাণ্ডের মূলভিত্তি। এই চারিটী মার্গ কর্ম্মকাণ্ডের সহায়ক, এবং এই চারিটী মার্গ যথাধিকারে সাধককে জ্ঞানোন্নতি প্রদানপূর্ব্বক নিদিধ্যাসনের পরিপক্ক অবস্থায় উপস্থিত করে। এই সাধনচতুষ্টয় যেপ্রকার সাধকের চিরসখা, সেইপ্রকার ইহারা ধর্ম্মোপদেশক, আচার্য্য এবং গুরুসম্প্রদায়ের পরম সহায়ক। কালমাহাত্ম্যে এই সাধনমার্গসমূহের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ এবং রহস্যের প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের কল্যাণার্থ এই সাধনচতুষ্টয়ের রহস্যজ্ঞান এবং ক্রিয়াসিদ্ধাংশের বীজ রক্ষা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

কলিযুগে দানধর্ম্মই প্রধান ; কারণ, কলিযুগ তমঃপ্রধান কাল। প্রাচীন আর্যদিগের মধ্যে যেরূপ নিঃস্বার্থভাবপূর্ণ কর্ম্মযোগের প্রচার অধিক ছিল, প্রাচীন আর্য্যগণ যেরূপ স্বার্থরহিত হইয়া নিজের প্রত্যেক ক্রিয়া এবং আচারের দ্বারা অহঙ্কারভাবকে দমন করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত নিজ জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়া একীভূত করিতে জানিতেন, এরূপ আর কোনও মনুষ্যজাতির মধ্যে হইতে পারিবে না। আর্য্যজাতির মধ্যে দানধর্ম্মেরও উচ্চ আদর্শ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর্য্যশাস্ত্রে দানবীরগণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। দানের সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদ বিচার করিয়া সাত্ত্বিক দানের মহত্ত্ব স্থাপন যেরূপ আর্য্যশাস্ত্রে করা হইয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা আর্য্যশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, তামসিক দানের দ্বারা কখনও কখনও নরক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, রাজসিক দানের দ্বারা ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অভ্যুদয় হয়, এবং সাত্ত্বিক দানের দ্বারাই কেবল মুক্তি হইয়া থাকে। যদি কেহ ১০ কোটী টাকা দান করিয়া মনে মনে নিজের

যশ কিম্বা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক সামান্য ইচ্ছাও করে, উহা রাজসিক দান হইবে। আর যদি কোনও ব্যক্তি একটী কপর্দ্দকও নিঃস্বার্থভাবে কোনও অতি দীন দরিদ্র বা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে দিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করে, তাহা হইলে তাহার ঐ ধর্ম্ম সাত্ত্বিকরূপে পরিণত হইবে। সনাতনধর্ম্মবিজ্ঞানের নিকট উক্তপ্রকার দশকোটী মুদ্রা দান অপেক্ষা ঐ কপর্দ্দক দান বহুগুণে মূল্যবান্। আর্য্যজাতির মধ্যে এইরূপ সাত্ত্বিকদান-সংস্কারের বীজরক্ষা করিতে হইবে।

সনাতনধর্ম্মের এই সকল অঙ্গের বীজ রক্ষা হওয়া সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, যাহার দ্বারা সনাতনধর্ম্মের মহত্ত্বের বিকাশ হইতে পারে, প্রজার মধ্যে ব্রহ্মতেজ, ক্ষাত্রতেজের বীজ রক্ষা হইতে পারে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নষ্ট হইতে না পারে, সতীত্বের তীব্র সংস্কার আর্য্যনারীদিগের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইতে না পারে, আর্য্য প্রজার মধ্যে জ্ঞানশক্তি এবং অর্থশক্তির অস্তিত্ব রক্ষিত হইতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির লৌকিক অভ্যুদয়ও সাধিত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বীর্য্যরক্ষা এবং যথার্থ বিদ্যাপ্রাপ্তি করাই মুখ্য ; গৃহস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম সকলের মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ সাধন এবং যথাশক্তি সাত্ত্বিক দানে অধিকতর রুচি বৃদ্ধি করা, ইহাই মুখ্য ধর্ম্ম ; বানপ্রস্থাশ্রম অর্থাৎ যে আশ্রম গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যবর্ত্তী আশ্রম, তাহাতে পরোপকারব্রত, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ, এবং নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করা অভ্যুদয়কারী ধর্ম্ম। এবং সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম্ম সকলের মধ্যে দ্বন্দ্বরহিত হইয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের সমতা স্থাপন করা এবং প্রজামাত্রের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করা, ইহা নিঃশ্রেয়সকারী ধর্ম্ম। শূদ্রদিগের মধ্যে সেবা-বুদ্ধি এবং দেশের শিল্পোন্নতি করা প্রশংসনীয় ধর্ম্ম ; বৈশ্যদিগের মধ্যে গোধন-বৃদ্ধি, কৃষির উন্নতি এবং বাণিজ্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন করা প্রধান ধর্ম্ম ; ক্ষত্রিয়দিগের নিমিত্ত শারীরিক বল, শৌর্য্য, স্বদেশানুরাগ এবং ঔদার্য্য ইহাই উন্নতিকারী ধর্ম্ম ; এবং ব্রাহ্মণবর্ণের নিমিত্ত বিদ্যা, তপ এবং ত্যাগ, ইহাই নিঃশ্রেয়সকারী ধর্ম্ম। মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্যসমূহমধ্যে স্বজাতীয় আচার রক্ষা, স্বদেশোন্নতি, ভগবদ্ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন করা প্রশংসনীয় ধর্ম্ম। যদিও জ্ঞানবান্, সমদর্শী, উদারহৃদয়, এবং ধর্ম্মজ্ঞ সজ্জনদিগের নিকট সমস্ত পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-

মত, সকল ধর্ম্মপন্থ, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই যথাধিকারে ধর্ম্মরূপী সূর্য্যের জ্যোতির যথাযোগ্য অধিকারী, কিন্তু ইহাও বিজ্ঞান-সিদ্ধ যে, অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূতরূপী ত্রিবিধ ভাব, এবং ত্রিবিধ শুদ্ধির কারণ স্বতঃপূর্ণ এবং সর্ব্ব-লোকহিতকর সনাতন ধর্ম্মকেই বলা যাইতে পারে। এই সকল শুভ প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তের উপর বিচার রাখিয়া মহামণ্ডলের কার্য্য বিস্তার হওয়া উচিত।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাযজ্ঞ সাধন।

সাধারণতঃ ধর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গ সকলকে শাস্ত্রে "যজ্ঞ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। * জীবক্রমোন্নতি-কারী যতপ্রকার সাধারণ ধর্ম্মসাধন আছে, তাহাদের সকলগুলিকেই যজ্ঞ বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস আদেশ করিয়াছেন যে, "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥" অতএব সকল আচার, সকল কর্ম্ম এবং সকল সাধনের মধ্যে অভ্যুদয় এবং মোক্ষপ্রদ যে ব্যাপক শক্তি আছে, তাহাকেই সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলা যায়, এবং ধর্ম্মের প্রধান প্রধান সাধনসমূহকে যজ্ঞ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মগণ ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম রূপ এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে এইপ্রকার ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞ এবং মহাযজ্ঞ শব্দার্থের মধ্যে আরও কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে।

মানবদিগের ক্রমোন্নতিকারী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সাধনকে অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবসমূহের উপকারক ধর্ম্মসাধনকে যজ্ঞ বলে, এবং সমষ্টিরূপী ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি করিবার যোগ্য সাধনকে "মহাযজ্ঞ" বলা যায়। আমরা এই কথাটী অন্য প্রকারেও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। জীব-স্বার্থের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে চারিপ্রকার ভেদ আছে। যথা—স্বার্থ, পরমার্থ, পরোপকার এবং পরমোপকার। তত্ত্বদর্শী

---

* দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

ইত্যাদি গীতোপনিষদ্।

মহাপুরুষগণ অনুভব করেন যে, জীবের ইহলৌকিক সুখসাধনকে স্বার্থ বলা যায়, পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত পুরুষার্থকে পরমার্থ বলা যায়। অন্য প্রাণি-সমূহের ইহলৌকিক সুখ সাধন করাইয়া আপনাকে সুখী মনে করিবার অধিকার যখন সাধক প্রাপ্ত হন তাহার নাম পরোপকার, এবং অন্য প্রাণিগণের পারলৌকিক কল্যাণ করাইবার অধিকারকে পরমোপকার বলা যায়। স্বার্থ এবং পরমার্থের সম্বন্ধ যজ্ঞসাধনের সহিত আছে, এবং পরোপকার ও পরমোকারের সম্বন্ধ মহাযজ্ঞের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। মহাযজ্ঞের অধিকার এই নিমিত্ত আরও উন্নত হওয়ায় উহার বিশেষত্ব বিবৃত হইল।

শাস্ত্রসমূহে যে, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ এই পাঁচটী যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ নাম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মূলেই এই রহস্য নিহিত আছে। নিত্যসিদ্ধ ঋষিগণ জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার নিমিত্ত পরমাত্মার অধ্যাত্ম-শক্তিপ্রদ স্থায়ী বিভূতি। * ঐ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের তৃপ্তি সাধনার্থ এবং জগতে জ্ঞানজ্যোতি বিকাশের সদ্বাসনার দ্বারা তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত যে নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিন বেদ এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্র অর্থানুগমপূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে, উহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা যায়। দেবতাগণও পরমাত্মার নিত্যসিদ্ধ অধিদৈব বিভূতি। জীবগণের সদসৎ কর্ম্মসমূহের অনুসারে উত্তম এবং অধম ফল প্রদান করাই তাঁহাদিগের কার্য্য। ঐ দেবতাসমূহের তৃপ্তি করিবার, তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধন দ্বারা আপনাদিগের কর্ত্তব্যরূপী ঋণ হইতে মুক্ত হইবার ও ব্রহ্মাণ্ডের

---

* অথৈতে কশ্যপো ব্যাসঃ সনকশ্চ সনন্দনঃ।
সনৎসনাতনৌ শুক্রো নারদঃ কপিলস্তথা॥
মরিচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো গৌতমঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্দক্ষোঽঙ্গিরাশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ॥
পতঞ্জলিভরদ্বাজৌ কণাদো জৈমিনিস্তথা।
মৈত্রেয়ঃ কৌশিকো যাজ্ঞবল্ক্যঃ শাণ্ডিল্য এব চ॥
পরাশরশ্চ বাল্মীকির্মার্কণ্ডেয়ো বুধাগ্রণীঃ।
ঋষয়ো নিত্যরূপা যে নিত্যজ্ঞানপ্রদায়িনঃ॥
বন্দে তান্ পরয়া ভক্ত্যা পূর্ণজ্ঞাননিকেতনান্।
(ইতি শ্রীগুর্ব্বাম্নায়ে)

কল্যাণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে দেবযজ্ঞ সাধিত হইয়া থাকে। * অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত সম্বন্ধ হইতে ঋষি, দেবতা এবং পিতৃ এই তিনই শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ সাক্ষাৎ বিভূতি। পিতৃগণের মধ্যে ত নিত্যপিতৃগণ আছেনই। + কিন্তু দেহ সম্বন্ধে নৈমিত্তিক পিতৃগণেয় সম্ভাবনাও শাস্ত্রসিদ্ধ। অর্থাৎ অর্য্যমা-আদি নিত্য পিতৃ ও আত্মীয়গণ দেহত্যাগ করিয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হইলে নৈমিত্তিক পিতৃ হয়েন। পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধন দ্বারা জগতের আধিভৌতিক উন্নতি করিবার সদ্বাসনাযুক্ত হইয়া পিণ্ডাদি দান করাকে পিতৃযজ্ঞ বলা যায়। উদ্‌ভিজ্জাদি সকলপ্রকার প্রাণীর তৃপ্তি ও কল্যাণের সদ্বাসনায় তত্তৎসম্বন্ধযুক্ত দেবতা-দিগের দ্বারা তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করাকে ভূতযজ্ঞ বলে। এবং যে কোন জাতি, যে কোন অধিকার, যে কোন ধর্ম্ম, এবং যে কোন দেশের মনুষ্য হউক, আপনার গৃহে অতিথিরূপে আগমন করিলে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত যথাযোগ্য সৎকার করিলে নৃযজ্ঞ সাধন হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস আদেশ করিয়াছেন, যে প্রকারে ব্যাঘ্র বনের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া থাকে, সেই প্রকারে আবার মৃগাদি জন্তু হইতে বনের

---

* সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
(ইতি গীতোপনিষদ্।)

\+ নমো বঃ পিতরো রসায়, নমো বঃ পিতরঃ শোষায়।
নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ॥
নমো বঃ পিতরো ঘোরায়ৈ, নমো বঃ পিতরো মন্যবে।
নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বো, গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত॥
সতো বঃ পিতরো দেষ্মৈতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত।
(ইতি যজুঃ।)

সুরক্ষা করিবার নিমিত্ত বনের রাজা ব্যাঘ্র কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বনের আশ্রয়ে এবং মৃগাদি ভক্ষ্য জন্তুর দ্বারা যেরূপ ব্যাঘ্র সম্বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পক্ষান্তরে অমূল্য উদ্ভিদ্ জীব সকলের রক্ষার জন্য বনের রাজা ব্যাঘ্র মৃগাদি জন্তু সকলের নাশ করিয়া বন রক্ষার কারণ হইয়া থাকে। ওষধি, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ-রূপী উদ্‌ভিদ্ জীবসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজাদি সকল-প্রকার প্রাণীর সহিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যখন ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা দেখা যাইতেছে, তখন ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সৃষ্টির কোন অঙ্গই উপেক্ষা করিবার যোগ্য নহে। সুতরাং ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, একটী অঙ্গের সহায়তা ব্যতীত দ্বিতীয় অঙ্গ পরিপুষ্ট থাকিতে পারে না। এক-বার স্থির হইয়া বিচার করিলেই নিশ্চয় হইতে পারে যে, অন্য প্রাণীর সহায়তা ব্যতীত মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের প্রত্যেক নিশ্বাসে লক্ষ জীব আত্মবলি প্রদান করে, মনুষ্যের তৃষ্ণার তৃপ্তির নিমিত্ত জলান্তর্গত অসংখ্য জীব আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে, মনুষ্যের ক্ষুধাশান্তি করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রাসে কত প্রাণীর বলি হইয়া থাকে, এবং মনুষ্যের ইহলৌকিক সুখ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কত প্রাণীকে ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। অপর প্রাণীর এরূপ ঋণ হইতে মনুষ্যের সম্যক্ প্রকারে মুক্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এই সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ দেবতাদিগের সহায়তায় যে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তাহা অবশ্যই মহাযজ্ঞশব্দবাচ্য হইবার যোগ্য। ঐ উদার দৃষ্টি অনুসারে বিবেচিত হইবে যে, একজন মনুষ্য সমস্ত মনুষ্যসমাজশরীরের একটী অঙ্গ, অতএব ধর্ম্মের বিশেষ কোন সাধন দ্বারা মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের এই একত্ব সম্বন্ধ চিরস্থায়ী রাখিয়া সাধন-সুকৌশল দ্বারা আত্মোন্নতি করাই নৃযজ্ঞের তাৎপর্য্য। উন্নত সাধক আপনার অন্তঃকরণের সঙ্কুচিত অধিকার যতই বিস্তৃত করিয়া আপনার জীবনের সহিত বিশ্বজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, ততই তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির অধিকারী হইবেন। মহাযজ্ঞসাধনে এই আধ্যাত্মিক ভাবের সম্পূর্ণ বিচার রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বিরাট্ ধর্ম্মকার্য্য সাধারণতঃ সর্ব্বলোক-হিতকর এবং বিশেষতঃ আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয়কারী হও-য়ায় ইহা যে মহাযজ্ঞপদবাচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহস্থদিগের নিত্যকর্ম্মান্তর্গত পঞ্চ মহাযজ্ঞের ন্যায় মহামণ্ডলেরও পঞ্চ কার্য্যবিভাগ রক্ষিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। অনাদিকাল হইতে এই পবিত্র ভূমিতে বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের সাধন হইয়া আসিতেছে। এই দৈবী ভূমিতে নিয়মিতরূপে অনেকানেক ভগদ্ভক্ত উপাসক উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এই শুদ্ধ-ভূমিতে হইয়াছে, এই নিমিত্ত এরূপ হীনাবস্থাতেও এই স্থানের সনাতনধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে যে ধর্ম্মশক্তি বিদ্যমান আছে, সেরূপ দৃঢ়শক্তি অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সনাতন ধর্ম্মের অসাধারণ শক্তিই ইহার কারণ যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে অসংখ্য ধর্ম্মমার্গ এই ভূমিতে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের নামমাত্রও এখন নাই। যেপ্রকার শরীরের মধ্যে কদাচিৎ দুঃখদায়ী স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত শরীরকে ক্লেশিত করিয়া শেষে ঐ শরীরের মধ্যেই লয় হইয়া যায়, সেইপ্রকার অসংখ্য উপধর্ম্ম ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় এই অনাদিসিদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অগণিত রাজবিপ্লব এবং অসংখ্য ধর্ম্মবিপ্লব সহ্য করিয়াও এই স্বতঃপূর্ণ সনাতন ধর্ম্ম আপনারই স্বরূপে অবস্থিত আছেন। ধর্ম্মপুরু-ষার্থের যে যে উত্তম সামগ্রী থাকা উচিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেক সামগ্রী আজিও সনাতনধর্ম্মাবলম্বী সমাজমধ্যে বিদ্যমান আছে। রাজানুশাসনের সহায়তা ব্যতীতও বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মের রীতি-সমূহ প্রায় আপন স্বরূপে প্রচ-লিত রহিয়াছে। সমাজের দৃঢ়তা আজিও অন্য ধর্ম্মসমূহের সামাজিক অনু-শাসন অপেক্ষা অধিক আছে। আপনার ধর্ম্মের মধ্যে হানি উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের সামান্য চেষ্টাতেই সকল প্রান্তের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজাজ্ঞার কোনও নিয়ম না থাকিলেও এবং নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অগণিত দেবালয় পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকিলেও এরূপ কোন নগর অথবা বৃহৎ গ্রাম নাই যেখানে নূতন দেবালয় নিয়মিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। কেহ অনুসন্ধান লউক অথবা নাই লউক, ভিক্ষা করিয়াও ব্রাহ্মণবালকেরা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে বিরত হইতেছে না। কোন লৌকিক স্বার্থ সিদ্ধ না হইলেও সংস্কৃতবিদ্যার পণ্ডিতগণ বিদ্যার্থী-দিগকে শিক্ষাদান করা আজিও পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কোন নগর অথবা বৃহৎ গ্রাম নাই যেখানে শেঠ, ধনী, রাজা, মহারাজা এবং জমীদারদিগের সংস্কৃত পাঠশালা নাই। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ তীর্থ-

স্থানে এত অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত আছে যে, চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ হইলেও কোন তীর্থে, লোকে অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এ বিষয়ে কাশীর অলৌকিক মাহাত্ম্য জগতে প্রসিদ্ধ আছে। চারিদিকে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন থাকিলেও তীর্থসমূহে লোকের জনতা লাগিয়াই থাকে। তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণ আপন ধর্ম্মকর্ম্ম এবং স্বরূপ সম্পূর্ণরূপ বিস্মৃত হইলেও তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা অন্য ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা উত্তম। ধর্ম্মের নামে কঠিন হইতে অতি কঠিন, অসম্ভব হইতেও অতি অসম্ভব কার্য্য করিবার প্রতিও লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। আজিও বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এবং আশ্রমগুরু সন্ন্যাসীদের আদর সমাজে বিদ্যমান আছে। এই সকল কারণে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আজিও ধর্ম্মের শক্তি বিদ্যমান আছে। কেবল এইমাত্র অভাব বলিতে হইবে যে, ভারতবাসী নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থাপদ্ধতি বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং যথার্থ জ্ঞানের অভাব হইয়া যাওয়ায় সাত্ত্বিক ভাবের স্থানে তামসিক ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। নিয়মবদ্ধ অনুশাসনব্যবস্থা (organization) না হওয়ায় এ সময়ে নানা প্রকারের অসুবিধা এবং ন্যূনতা দেখিতে পাওয়া যাই-তেছে। বস্তুতঃ সনাতনধর্ম্মাবলম্বী সমাজকে নিয়মবদ্ধ করিয়া নিষ্কাম পুরুষার্থের পুনঃ প্রবৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্মোন্নতিকারিণী সামাজিক অনুশাসনব্যবস্থা-শক্তির আবির্ভাব করাইবার নিমিত্তই শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের জন্ম হইয়াছে।

নিয়ম পালন করাই অনুশাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই নিয়মপালন করিবার শক্তির দ্বারাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহ নক্ষত্র আপনার স্থানে অবস্থিত আছে এবং এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়কার্য্য আপ-নার ক্রমানুসারে নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। ভগবদাজ্ঞার মিলন হই-তেই মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য নিশ্চয় হওয়া উচিত। বস্তুতঃ এই সংসারে যাঁহারা নিয়মপালনে তৎপর থাকেন, তাঁহাদের উন্নতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের মাননীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়মশক্তির নিমিত্তই তাঁহাদিগের বিস্তৃত রাজ্যমধ্যে সূর্য্যদেব অস্তমিত হন না। বৃটিশ সাম্রাজ্য সমস্ত পৃথিবীমধ্যে সকলের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, ধনবান্ এবং নীতিজ্ঞ। যেন স্বয়ং প্রকৃতি-মাতা নানা প্রকারে তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। নিয়মপালনের উপকারিতার মহিমা সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করা অসম্ভব। নিয়মপালনের দ্বারা জড়পদার্থসমূহের

শক্তি এরূপ বৃদ্ধি হইয়া যায় যে, উন্নত মনুষ্যগণও তাহাদিগের সেবক হইয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক রহস্যের ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে, রেলগাড়ীর ন্যায় জড়পদার্থের পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিবার নিমিত্ত পরম তপস্বী এবং যোগিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা ও মহারাজগণ পর্য্যন্তকেও সর্ব্বদা তৎপর দেখা যায়। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত নিয়মবদ্ধ ক্রমের সহিত ধর্ম্মোন্নতিকার্য্য প্রচলিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সফলতার কোন আশা নাই।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের শাসনভার ক্ষত্রিয় রাজাদিগের উপরেই ন্যস্ত ছিল, এবং শাস্ত্র ও আচার্য্যদিগের অনুশাসনাধীন থাকিয়া নরপতিগণ আপনাদিগের রাজানুশাসন দ্বারা প্রজাদিগকে নিয়মবদ্ধরূপে রক্ষা করিতেন। যদিও আজিও পরম দয়ালু পরমেশ্বরের অপার অনুগ্রহে আর্য্য প্রজাদিগের এ-প্রকার নীতিজ্ঞ এবং উদার গবর্ণমেণ্ট মিলিয়াছে যে, যাঁহাদিগের মত উন্নত এবং প্রজারঞ্জক গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয়দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সমস্ত পৃথিবীতে অপর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি রাজার জাতি অন্যধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মোন্নতিকর কার্য্যসমূহে অধিক সহায়তা প্রদানে অসমর্থ। কিন্তু তাঁহাদিগের উদারতার দ্বারা আর্য্য প্রজাদিগের এরূপ সুসময় মিলিয়াছে যে, এ সময় তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করেন, সেইরূপই উত্তম ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ করিয়া আপন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় করিতে সক্ষম হইতে পারেন। সুতরাং আর্য্যজাতিকে এক্ষণে এই ভগবদ্দত্ত সু-অবসর বৃথা নষ্ট না করিয়া জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং দ্রব্যশক্তি সংগ্রহপূর্ব্বক ভারতবর্ষব্যাপিনী এই স্বজাতীয় বিরাট্ ধর্ম্মসভার দৃঢ়তা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

নিয়মবদ্ধতা (Discipline) এবং অনুশাসন-ব্যবস্থা (Organization) যথারীতি স্থাপিত না হইলে কোন মহৎকার্য্য পূর্ণ হয় না। নিয়মবদ্ধতা এবং অনু-শাসন—ব্যবস্থাই সংঘশক্তি আবির্ভাব করিবার প্রধান উপায়। নিয়মবদ্ধতা এবং অনুশাসন-ব্যবস্থা দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ হইয়া থাকে। এবং একমাত্র সংঘশক্তি দ্বারাই কলিকালে সফলতা প্রাপ্তি হয়। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস আদেশ করিয়াছেন যে, কলিযুগে সংঘশক্তির (পঞ্চায়তী শক্তির) প্রাধান্য হইবে; *

* ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে।
দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে॥
ইতি ভগবান্ ব্যাসঃ।

নিয়মবদ্ধ সভাসমিতির দ্বারা এই যুগে বড় বড় শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আপনাদিগের তপোবল দ্বারা পূর্ব্ব যুগসমূহে, যে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রকাশিত হইয়া যাইতেছে। এ সময়ে সংঘশক্তির দ্বারা ইউরোপ এবং আমেরিকায় কোন্ কার্য্যই বা সম্পাদিত হইতেছে না? ঐ সকল দেশে সংঘশক্তির দ্বারা তত্রত্য অধিবাসীদিগের ধর্ম্মের সুব্যবস্থা হইতেছে, সংঘশক্তির দ্বারাই তত্রত্য বিদ্যাবিভাগের সকলপ্রকার ব্যবস্থাই চালিত হইতেছে। সংঘশক্তির দ্বারা ঐ সকল দেশে শিল্প এবং বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি হইতেছে। সংঘশক্তির দ্বারাই তত্রত্য রাজানুশাসনের সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইউরোপ এবং আমেরিকা সংঘশক্তির বিচারে আদর্শভূমি, এবং জাপানের অসাধারণ উন্নতি এই সংঘশক্তিরই সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ।

ভগবদবতার শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের আদেশ অবলম্বন করিয়া এবং বর্ত্তমান কালের উক্ত জাতি সকলের অভ্যুদয় এবং সফলতার উদাহরণ গ্রহণ করিয়া এক্ষণে আর্য্যজাতিকে আপন অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির নিমিত্ত আপনাদিগের স্বজাতীয় সংঘশক্তি সম্পাদন করা উচিত। "অর্গানাইজেশন" (Organizaion) অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ অনুশাসনব্যবস্থা-প্রণালী বিষয়ের সহায়তায় স্বজাতীয় সংঘশক্তির উৎপত্তি দ্বারাই আর্য্যজাতি আপনাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিয়া আপনাদিগের সকলপ্রকার কল্যাণ সাধন করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য আর কোন উপায় নাই। চিন্তাশীল মুনিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, বৃহৎ কার্য্য করিবার উপযোগী কোন বৃহৎশক্তি উৎপন্ন করিতে গেলে যথাবশ্যক দ্রব্যশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই ত্রিবিধ কারণের সমাবেশ করিতে হইবে। এসময় আর্য্যজাতি ঘোর স্বার্থপরতা-রোগে উন্মত্ত হইয়া এরূপ দীন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে যে, যে অর্থকে আপনাদের পূর্ব্বাবস্থায় তাহারা ধর্ম্ম, লোকহিত এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিকট তুচ্ছজ্ঞান করিত, এক্ষণে সেই অর্থকে পরম পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। এবং উত্তম কার্য্যে অর্থব্যয় না করিয়া যক্ষের ন্যায় উহার সংগ্রহপূর্ব্বক রক্ষা করাই পরম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে। বস্তুতঃ এই ঘোর সময়ে তাহাদিগের দ্বারা এই মহাযজ্ঞের নিমিত্ত ধনদান করান কঠিন কার্য্য। অতএব এই মহাযজ্ঞের নিমিত্ত দ্রব্যশক্তি সংগ্রহ করিবার

সম্বন্ধে দুইটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করা উচিত। প্রথম অর্থসংগ্রহ নিমিত্ত এমন এমন সুগম উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা এই অধঃপতিত জাতির সাধারণতঃ ধনদান করিবার পক্ষে বিশেষ কঠিনতা উপস্থিত না হয়। এবং দ্বিতীয়তঃ এই বিরাট্ সভার প্রধান ধনভাণ্ডার এরূপ দৃঢ় নিয়ম এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার সহিত স্থাপিত করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারা প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর বিশ্বাস এই স্বজাতীয় ধনভাণ্ডারের উপর স্থাপিত হইতে পারে। ত্রিগুণের অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে গুণত্রয়ের বৃত্তির পরিবর্ত্তন সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। যেরূপই অসাত্ত্বিক মনুষ্য হউক না কেন, কখন না কখন তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হওয়া সম্ভব। যে কোনও কারণে যখনই সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হওয়ায় কাহারও মধ্যে দান করিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, সেই সময় যদি তাহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, আমার প্রদত্ত ধন আমা অপেক্ষা অধিক সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় হইবে, তবে সেই সময় তাহার ন্যায় ব্যক্তির দানপ্রবৃত্তির অবশ্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। এবং ক্রমশঃ এই বিরাট্ সভার মূলকোষ কালক্রমে অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই মহাযজ্ঞের প্রধান সহায়ক হইতে পারে।

মূলকোষের কার্য্যভার এরূপ কোন বিশ্বস্ত মহারাজা অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে, যাহার উপর সমস্ত জাতির বিশ্বাস আছে। এরূপ যোগ্য ব্যক্তির উপর মূলকোষ সমর্পণ করিয়া অন্যান্য প্রান্তীয় কোষসমূহেরও এইরূপই দৃঢ় ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়ব্যয় নিরীক্ষণ, আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা, ব্যয়ের অবধারণ এবং হিসাব প্রভৃতির এরূপ দৃঢ় নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া সকল কার্য্যের উপর যথাযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে আর্য্যজাতির কোন বিষয়ে আশঙ্কা হইবার সম্ভাবনা না থাকে; এবং এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হইবে যে, এই বিরাট্ সভার সংরক্ষক এবং প্রতিনিধি সভ্যমহোদয়গণ অবশ্যই মূলকোষের পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহাদিগের স্বরূপ এবং শক্তির অনুকূল কিছু এককালীন দান করিবেন। ধনসমাগমের দ্বিতীয় উপায় এই হওয়া উচিত যে, রাজা, মহারাজা এবং জমীদারদিগের নিকট হইতে স্থায়ী দানপত্রের দ্বারা মাসিক অথবা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং

তদতিরিক্ত প্রান্তীয় ধর্ম্মমণ্ডল, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীর শাখাসভাসমূহ হইতে আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রান্তীয় কার্য্যালয় এবং শাখাসভাসমূহের দ্বারা অথবা সভ্য মহোদয়দিগের দ্বারা যে স্থায়ী রূপে সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা এই শ্রেণীর আয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। ধনসমাগমের তৃতীয় উপায় ইহা করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের যে সকল প্রান্তে প্রান্তীয় কার্য্যালয় থাকিবে, সেই সকল প্রান্ত হইতে সাধারণ রূপে যে বার্ষিক অথবা মাসিক চাঁদা সর্ব্ব-সাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অথবা সেই সকল প্রান্তীয় ধর্ম্ম-মণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই সকল তত্তৎ প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের দ্বারা ব্যয়িত হইবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকারের ধনাগমের সম্বন্ধ এই বিরাট্ সভার প্রধান কার্য্যালয়ের সহিত থাকিবে, এবং তৃতীয় প্রকারের ধনাগম-সম্বন্ধ তত্তৎ প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের সহিত থাকিবে। এইরূপ হইলে আয়ব্যয়ের সুবিধা থাকিবে এবং সকলের পুরুষার্থ এবং উৎসাহ যথাধিকার বিভক্ত থাকিবে। ধনসমাগমের চতুর্থ উপায় এই হউক যে, ভারত-বর্ষের প্রধান প্রধান নগর এবং গণ্ডগ্রামসমূহের মধ্যে যে যে স্থানে বাজার, হাট, গঞ্জ এবং বন্দরাদি আছে, মহামণ্ডলের কার্য্যকর্ত্তৃগণ এবং শাখাসভাসমূহ যত্নপূর্ব্বক তত্তৎ স্থানের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর একটী অতি অল্প ধর্ম্ম-বৃত্তি স্থাপন করাইবেন। এবং ঐ রূপে বড় বড় কুঠীয়াল, ব্যবসায়ী এবং যৌথ-কারবারী কোম্পানী-আদির ক্রয়-বিক্রয়াদিতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-বৃত্তি স্থাপন করাইবেন ও সম্ভব হইলে কোন কোন রাজ-সরকারেও সুকৌশলপূর্ণ ধর্ম্ম-বৃত্তির ব্যবস্থা করাইবেন। ঐ ধর্ম্ম-বৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ খরচ করিবার নিমিত্ত সেই নগরের শাখাসভাকে অধিকার প্রদত্ত হইবে। ধর্ম্মবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ প্রধানতঃ সেই নগরেই শাখাসভা অনাথালয়, বিদ্যালয়াদি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় হইবে। এবং সেই নগরের ধর্ম্মকার্য্য হইতে যে কিছু অর্থ প্রতিবর্ষে উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা মহামণ্ডলের স্থায়ী কোষে প্রেরিত হইবে। এই চতুর্থ কোষের লাভ হইতে তত্তৎ গ্রাম, নগর এবং প্রান্তীয় মণ্ডল বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। অর্থসমা-গমের পঞ্চম উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সুগম হওয়া উচিত। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী মাত্রকে এই বিরাট্ সভার সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা কোন অতি সুগম নিয়ম পালন করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্যূন ১৲

টাকা বার্ষিক সহায়তা গ্রহণ করা যাইবে। সকল সভ্য মহোদয়কে মহামণ্ডলের মাসিক-পত্র বিনা মূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই বিরাট্ সভার মাসিক-পত্রসমূহ এরূপ ভাষাসমূহে বিভিন্ন নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে প্রকাশিত করা যাইবে, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের অধিবাসিগণ আপন আপন মাতৃভাষার দ্বারা এই বিরাট্ সভার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জাতীয় ধর্ম্মোন্নতির সংবাদসমূহ নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু চরম লক্ষ্য ইহাই রাখিতে হইবে যে, যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে এক হিন্দীভাষা এবং অন্ততঃ পক্ষে একমাত্র দেব-নাগর অক্ষরের প্রচার হইতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা এই স্বজাতীয় বিরাট্ সভার পুষ্টি হইবে, সকল প্রান্তে শক্তি বৃদ্ধি হইবে, এবং সকল অধিকারের আর্য্য প্রজার সহিত মহাসভার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিবে। এই পঞ্চম উপায় দ্বারা বহুধনসমাগমের সম্ভাবনা আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন ভাষায় মাসিক-পত্রসমূহ প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত অনেক ব্যয় হইবারও সম্ভাবনা আছে। তথাপি উত্তম ব্যবস্থা হইলে এবং আর্য্য প্রজার রুচি এই সভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গেলে এই কোষের আয়ের দ্বারা এই বিরাট সভার মাসিকপত্র এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের সমস্ত কার্য্য উৎকৃষ্ট রীতিক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াও অন্যান্য ধর্ম্ম-বিভাগসমূহের সম্পূর্ণ সহায়তা মিলিতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে আর্য্য প্রজা যদি সচেষ্ট হন, তবে এই পঞ্চম কোষ অন্য কোনও কোষের অপেক্ষা না রাখিয়া সকল কার্য্যই করিতে পারিবে। কারণ সামান্য যত্নে কোটী কোটী সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ সভ্য হওয়া অসম্ভব নহে। মূল কোষের ভার প্রধান সভাপতি-কার্য্যালয়ের উপর, দ্বিতীয় কোষের ভার প্রধান কার্য্যালয়ের উপর, তৃতীয় কোষের ভার তত্তৎ প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের উপর, চতুর্থ কোষের ভার তত্তৎ স্থানীয় শাখাসভাসমূহের উপর এবং পঞ্চম কোষের ভার মহামণ্ডলের ছাপাই বিভাগ কার্য্যালয়ের উপর অর্পণ করিলে এবং সকলের কার্য্য যথাবৎ চালাইয়া সকল কোষের উন্নতির নিমিত্ত যথাবৎ উৎসাহ দিবার নিয়ম রক্ষা করিলে দ্রব্যশক্তির অবশ্য উন্নতি হইবে।

লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। লোকসংগ্রহের দ্বারা ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সভ্যপদ প্রদান করিলে এবং যথাযোগ্য অধিকারে ভার ন্যস্ত করিয়া

তাঁহাদিগের দ্বারা যথাযোগ্য কার্য্য লইবার ব্যবস্থা করিলে ক্রিয়াশক্তির উন্নতি হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এ সময় আর্য্য প্রজা অধঃপতিত হওয়ায় তাঁহাদিগের বিষয়ে বিচার করিলে হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এ সময় অধিকাংশ আর্য্য প্রজা আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন না। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, এই মহাযজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ এবং এই পরম ধর্ম্মের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে, তাঁহারা এ সময়ে সর্ব্বথা অযোগ্য। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে স্থানে যেপ্রকার সামগ্রী (মাল মসলা) পাওয়া যায়, তথায় তাহারই দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এবং ইহাও নিশ্চয় যে, যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে সাধারণ সামগ্রীর দ্বারাও ক্রমশঃ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

সুকৌশলপূর্ণ কার্য্যকে যোগ বলে। * এই যোগসাধনের এরূপ মহিমা আছে যে, লৌকিক ক্রিয়া হইতে অলৌকিক ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। উদাহরণস্থলে বিচার করা যাইতে পারে যে, মন্ত্রযোগ এবং হঠযোগের স্থূল লৌকিক ক্রিয়াসমূহের সাধন হইতে অলৌকিক ঈশ্বরীয় সিদ্ধিসমূহ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে, পরন্তু প্রাকৃতিক যোগক্রিয়াই অপ্রাকৃতিক মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে। এই সুকৌশলপূর্ণ যোগক্রিয়ারই ইহা মহিমা যে, যে কর্ম্ম জীবের বন্ধনের কারণ, সেই কর্ম্মযোগের সহায়তা অবলম্বন করিলে তাহাই জীবের মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। যোগের সহায়তায় বিষও অমৃত হইয়া যায়। ফলতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তি, পরোপকারব্রত এবং নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া যদি এই মহাযজ্ঞের সাধন করা যায়, তবে এরূপ বিপরীত কালেও এরূপ অধঃপতিত জাতির কল্যাণ হওয়া নিশ্চিত।

লোকসংগ্রহ বিষয়ে এই বিরাট্ সভার সভ্যশ্রেণীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত। প্রথম শ্রেণীর সভ্য মহোদয়দিগের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের সকল প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য এবং স্বাধীন নরপতিদিগকে গ্রহণ করা সুবিধাজনক। এই সকল সভ্য মহোদয়দিগের অধিকার সর্ব্বোপরি বুঝিতে হইবে, ইঁহারাই সংরক্ষক বলিয়া অভিহিত হইবেন। ধর্ম্মব্যবস্থা

* যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। ইতি গীতোপনিষদ্।

এবং অর্থব্যবস্থা বিষয়ে এই উভয় বিভূতি যথাক্রমে সর্ব্বপ্রধান বিবেচনা করিবার যোগ্য। ফলতঃ এই সম্মানসূচক ব্যবস্থা হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা যথাসম্ভব সহায়তা লইবার নিয়ম রক্ষা করিলে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য শক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রেরণা এবং প্রজার সহানুভূতির দ্বারা তাঁহারাও আপন অধিকার রক্ষা করিতে তৎপর হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষকে প্রান্তীয় ধর্ম্মমণ্ডলে বিভক্ত করিয়া প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপন করিবার সুবিধা হইবে। উক্ত সকল প্রান্তের গণ্যমান্য নরপতি, জমিদার, শেঠ, সাহুকার এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ হইতে বাছিয়া লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। এই সকল সভ্য মহোদয়ের অধিকারে মহামণ্ডলের কোষ রক্ষা, নিয়ম-উপনিয়মসমূহ প্রস্তুতকরণ, এবং কার্য্যপ্রণালীর উপর আধিপত্য করিবার সাক্ষাৎ ভার থাকিবে। এবং তাঁহারা প্রতিনিধি নামে অভিহিত হইবেন।

আজিও আর্য্যজাতির মধ্যে নিয়মবদ্ধ অনুশাসনব্যবস্থা (Oranization) বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। যদিও লক্ষ্য, নির্ব্বাচনপ্রথার দিকে রাখাই কর্ত্তব্য ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহা এখন সম্ভব নহে যে, সাধারণ নির্ব্বাচনপ্রণালী হইতে প্রতিনিধি সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইতে পারে। যদিও এই সকল প্রতিনিধি মহাশয় প্রজার পক্ষ হইতেই প্রতিনিধি হইবেন, তথাপি তাঁহাদিগের সকলকেই নিয়মিত সময়ে নির্ব্বাচন করা এ সময় অসুবিধাজনক হইবে। অতএব এরূপ প্রতিনিধিদিগের কতক অংশ প্রান্তীয় ব্যবস্থা বন্ধন করিবার সময় স্থায়ী রূপে বাছিয়া লইতে হইবে এবং অবশিষ্ট কতক অংশের নিমিত্ত এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, যে শাখা-ধর্ম্মসভাসমূহ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিবেন, সেই সকলকে প্রতি তৃতীয়বর্ষে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইবে। এপ্রকার নিয়মের দ্বারা প্রজার মধ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সকল শাখা-ধর্ম্মসভা মহামণ্ডলের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহারা পুরুষার্থ করিবার উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে। সকল প্রান্তের প্রতিনিধিদিগের সম্মিলন হইতে একটী বড় প্রতিনিধিসভা গঠিত হইবে, যাহাতে সভাপতি এবং মন্ত্রী-আদিও নিযুক্ত থাকিবেন এবং প্রত্যেক প্রান্তীয় মণ্ডলের প্রতিনিধি মহোদয়গণ আপন আপন প্রান্তসমূহে আপনার প্রান্তীয়

সভাপতি এবং মন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া আপন আপন প্রান্তীয় মণ্ডলসমূহের ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন।

ধর্ম্মব্যবস্থার নিমিত্ত যে তৃতীয় শ্রেণীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগের নাম ব্যবস্থাপক রাখাই যুক্তিযুক্ত। প্রতিনিধি মহাশয়দিগের ন্যায় ব্যবস্থাপক মহাশয়ও সকল প্রান্তীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। ব্যবস্থাপক মহাশয় কেবল সদাচারী, ধর্ম্মজ্ঞ, সংস্কৃতাধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতেই বাছিয়া লওয়া যাইবে। তাঁহারা মহামণ্ডলের দ্বারা সম্মানিত, পুরস্কৃত এবং ক্রমোন্নত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদানপূর্ব্বক এবং অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য-সমূহে সহায়ক থাকিয়া আর্য্যজাতির ধর্ম্মোন্নতি সাধন করাইবেন।

চতুর্থ শ্রেণীর সভ্যগণের সহায়ক আখ্যা প্রদত্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কোন প্রদেশের কোন সম্প্রদায় অথবা কোন অধিকারের যে যে যোগ্য পুরুষকে মহামণ্ডল সম্মান প্রদান করিতে ইচ্ছা করিবেন, যে মহাশয়গণ কোথাও সংস্কৃত বিদ্যা এবং সনাতন ধর্ম্মের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা অথবা স্বার্থত্যাগ করিবেন, অথবা মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যের নিমিত্ত যে সকল ধর্ম্মাত্মা অল্প বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকে সহায়ক-সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে। বিদ্যা সম্বন্ধে সহায়ক, ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে সহায়ক, ধনদান সম্বন্ধে সহায়ক, ধর্ম্মসেবী ব্রাহ্মণগণ এবং পরোপকারব্রতধারী সাধুগণ, এই প্রকারে ৫ বিভাগের সহায়ক সভ্য হইবেন। এবং পঞ্চম শ্রেণীর সভ্যগণ সাধারণ সভ্য নামে অভিহিত হইবেন। সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই কোন্ প্রকারে সাধারণ সভ্য হইতে পারিবেন, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং সুকৌশলপূর্ণ রীতির দ্বারা এই মহাযজ্ঞ সম্পাদনার্থ এইপ্রকার লোক সংগ্রহ করা যাইবে, যাহাতে আর্য্যজাতির কোন অংশই উপেক্ষণীয় না হয়। যদিও সংরক্ষক মহোদয়, প্রতিনিধি মহোদয় এবং ব্যবস্থাপক মহোদয়দিগের মধ্যে স্ত্রীজাতি গণ্য হইতে পারেন না, কিন্তু সহায়ক-সভ্য-শ্রেণীতে এবং সাধারণ-সভ্যশ্রেণীতে কুলকামিনীগণকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলে মহাযজ্ঞে সহায়তা প্রাপ্তি হইতে পারা যাইবে। এই সুকৌশলপূর্ণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিলে আর্য্যজাতির লোকসংগ্রহশক্তির পূর্ণতা হইতে পারিবে।

আর্য্যজাতির বৈদিক পঞ্চ মহাযজ্ঞের ন্যায় অধ্যাত্ম মহাযজ্ঞেরও পঞ্চ কার্য্য-

বিভাগ হওয়া ধর্ম্মানুকূল হইবে। প্রথম ধর্ম্মপ্রচারবিভাগ দ্বারা ভারতবর্ষের নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে শাখা-ধর্ম্মসভাসমূহ স্থাপন করিতে হইবে, এবং তাহাদিগকে দৃঢ় নিয়মসমূহের সহিত চালাইয়া জীবিত রাখিতে হইবে। ধর্ম্ম-শাখাসভা ব্যতীত অন্যান্য উপযোগী সভাসমূহের সহিতও সম্বন্ধ স্থাপনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইবে। উহাদের নাম পোষকসভা হইবে। এই বিভাগের দ্বারা পোষকসভাসমূহকেও সম্বন্ধযুক্ত করিতে হইবে অর্থাৎ মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য-সমূহের মধ্য হইতে কোন উদ্দেশ্য-পুষ্টিকারিণী সভা সকল পোষকসভা রূপে সম্বন্ধ-যুক্ত হইতে পারিবে। বিদ্যা-উন্নতিকারী, সমাজ-উন্নতিকারী, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, পদার্থবিদ্যা-আদির উন্নতি-কারী, সকল সভাই পোষকসভা রূপে সম্বন্ধযুক্ত (affiliated) হইতে পারিবে। ধর্ম্মোপদেশক, ধর্ম্মপ্রচারক, পুস্তক এবং মাসিকপত্রাদির দ্বারা এই কার্য্যবিভাগ, শাখাসভা ও পোষক-সভা-সমূহ সভ্য মহোদয়গণের সহায়তা করিবে। যে যে কার্য্যের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার বিষয়ে এবং তাহার পুনরভ্যুদয় বিষয়ে সুবিধা হইবে, তাহা এই কার্য্য-বিভাগ করিবে।

দ্বিতীয় কার্য্যবিভাগের নাম ধর্ম্মালয়সংস্কার-বিভাগ হইবে। সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তীর্থ, মঠ, মন্দির, অন্নসত্র, ধর্ম্মশালা এবং সকলপ্রকার ধর্ম্মালয়ের সংস্কার, উন্নতি এবং সুরক্ষা করিবার কার্য্যভার এই কার্য্যবিভাগের দ্বারা সাধিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির এত ধর্ম্মালয় আছে যে, তত ধর্ম্মালয় পৃথিবীর অপর কোন জাতির নাই। আজিও আর্য্যজাতির আয়ের বিচারে তাহাদের ধর্ম্মালয়-সমূহের ধনাগম অনেক অধিক আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্যজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মালয়সমূহের এরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে যে, ঐ হীন-তার কথা যতই বলা যায়, তাহাই অল্প। এখনও যদি নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থার দ্বারা ঐ সকল ধর্ম্মালয়ের দাতৃগণের সহায়তা লইয়া উত্তম ধর্ম্মানুরাগী পরিদর্শক এবং সুপ্রবন্ধকারী সভাসমূহের সহায়তায় ঐ সকল ধর্ম্মালয়ের সংস্কার এবং সুরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে এখনও বহুল পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দান যথাযোগ্য ধর্ম্মকার্য্যে সাত্ত্বিক রীতিক্রমে ব্যয় করা হইলে আর্য্যজাতির উন্নতি বিষয়ে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীমহামণ্ডলের তৃতীয় কার্য্যবিভাগের নাম "শ্রীসারদামণ্ডল" রাখিয়া

উহাকে কোন্ প্রকারে কার্য্যকারী রূপে প্রস্তুত করা উচিত, তাহা বিস্তারিত রূপে "সুপথ্য-সেবন" নামক অধ্যায়ে বর্ণন করা হইয়াছে। সংস্কৃত পুস্তকসমূহ,—যাহা ধর্ম্ম এবং জ্ঞানোন্নতির একমাত্র ভাণ্ডার, তাহাদিগের সংগ্রহ, প্রকাশ, অনুসন্ধান এবং সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিভাগ হওয়া উচিত। এই চতুর্থ কার্য্যবিভাগের নাম পুস্তকসংগ্রহ-বিভাগ অথবা অপর কোন উপযুক্ত নাম প্রদত্ত হউক। এবং এই সকল কার্য্যবিভাগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রপ্রকাশ-মুদ্রাঙ্কন-আদি বিভাগ স্বতন্ত্র স্থাপন করা হউক। কোন সার্ব্বজনিক নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থা (organization) স্থাপনপূর্ব্বক তাহা চিরস্থায়ী রূপে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশ এবং মুদ্রাঙ্কনকার্য্য পরমাবশ্যক। এই পঞ্চম বিভাগের অধীনে একটী স্বজাতীয় আদর্শ পুস্তকালয় (বিক্রয়ভাণ্ডার) এবং একটী সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ যন্ত্রালয় (ছাপাখানা) স্থাপন করিয়া এই বিভাগকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। এই প্রকারে এই মহাযজ্ঞের পঞ্চ কার্য্যবিভাগ সকলেই স্বতন্ত্রতা এবং দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিতে করিতে আর্য্য জাতির এবং ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় বিষয়ে পরমোপযোগী হইবে।

এই বিরাট্ সভার প্রধান কার্য্যালয়, সনাতন ধর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল কাশীপুরীর একটী বিস্তৃত, উপযোগী এবং পবিত্র স্থানে স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য একটী সুদৃঢ়নিয়মবদ্ধ প্রবন্ধকারিণী সভার দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। উক্ত প্রবন্ধকারিণী সভার যদিও শ্রীকাশীপুরীরই আবশ্যকীয় মহোদয়গণ সভ্য হইবেন, কিন্তু অপর সমস্ত প্রান্তীয় মণ্ডল হইতেও এই সভার যথাযোগ্য সভ্য এই রীতির অনুসারে এরূপ ভাবে সম্মিলিত হইবেন যে, ঐ সুকৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা সকলে উৎসাহিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হন। এবং ঐ উদাহরণ অনুসারে সকল প্রান্তীয় মণ্ডলেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধকারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রধান প্রবন্ধকারিণী সভা এবং প্রান্তীয় প্রবন্ধকারিণী সভা যথাযোগ্য সভাপতি এবং অধ্যক্ষ (কার্য্যকর্ত্তা) দ্বারা এই প্রকারে যুক্ত থাকিবে যে, তাহা হইতে উক্ত কার্য্যালয়সমূহের কার্য্য যথাবিধি নির্ব্বাহ হইতে পারে।

প্রধান কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের নাম প্রধানাধ্যক্ষ রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে। ঐ সকল প্রবন্ধকারিণী সভার নির্ব্বাচন নিয়মিত সময়ে হইয়া কার্য্যের পুষ্টি এবং

সার্ব্বজনীন প্রসন্নতা লাভ করা অতি আবশ্যক হইবে। যাহাতে সকল কার্য্যালয় এবং প্রধান প্রধান কার্য্যকর্ত্তাদিগের মধ্যে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, যাহাতে সকলে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন, যাহাতে সকলে আপন আপন অধিকারানুসারে আপনার কার্য্য করিতে করিতে অন্যকার্য্য যথাক্রমে দেখিতে পারেন, এরূপ সুদৃঢ় এবং সুকৌশলপূর্ণ নিয়ম এবং উপনিয়মসমূহের প্রণয়ন করিয়া এই মহাযজ্ঞ-সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। এরূপ সুকৌশলপূর্ণ নিয়ম এবং উপনিয়ম দ্বারা এই স্বজাতীয় বিরাট্ ধর্ম্মসভাকে নিয়মবদ্ধ করিতে হইবে যে, সকলপ্রকার অধিকারী ইহাতে সম্মিলিত হইয়া ইহার সমষ্টিশক্তির বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে সংস্কৃতশিক্ষার উন্নতি এবং সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত যে সভা, সমিতি, বিদ্যালয়, পুস্তকালয় এবং নানাপ্রকার ধর্ম্মালয় আছে, সেই সকল পারস্পরিক প্রেম এবং সহায়তার নিমিত্ত এই বিরাট্ সভার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে।

এই বিরাট্ সভার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল ব্যক্তি এবং সভা-আদিকে স্ব স্ব অধিকার এবং সম্মানানুসারে সম্মানপত্র, প্রমাণপত্র প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে করিতে তাঁহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এবং যখন এই বিরাট্ সভার মহাধিবেশন হইবে, সেই সু-অবসরে সদ্বিদ্যা এবং ধর্ম্ম-পুরুষার্থের সহায়ক যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত উপাধি এবং পুরস্কার-চিহ্নাদির দ্বারা উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা এই মহাযজ্ঞের সাধনানুকূল হইবে। ক্রমে এই মহাসভার শক্তি বৃদ্ধি হইলে স্বাধীন নরপতিগণ হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে নিরক্ষর ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি পর্য্যন্ত স্বজাতীয় সম্মান লাভ করিয়া জাতীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং বিদ্যানুরাগকল্পে উৎসাহান্বিত হইতে পারিবেন। স্বজাতীয় তিরস্কার এবং পুরস্কারপদ্ধতির পুনঃ প্রচার হওয়ায় সমাজ এবং সমাজপতিগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারিবেন। ক্রমশঃ এই বিরাট্ সভার যোগ্যতা বৃদ্ধি হইলে বড় বড় রাজা মহারাজাগণও এই মহাযজ্ঞে যশোলাভ করিবার নিমিত্ত ইহার সম্মানপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মসেবায় প্রবৃত্ত হইবেন।

কেবল দ্রব্যসংগ্রহেই দ্রব্যশক্তির বৃদ্ধি হয় না, পরন্তু সংগৃহীত দ্রব্যকে সাত্ত্বিক রীতি অনুসারে উদ্দেশ্যানুকূল ব্যয় করিলে দ্রব্যশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ফলতঃ এই বিরাট্ সভার কার্য্যকর্ত্তা মহাশয়দিগের দৃষ্টি যেপ্রকার এই কোষ-সমূহের সংবর্দ্ধনের প্রতি রাখা উচিত, সেইপ্রকার তাঁহাদিগের ইহাও দৃষ্টি থাকা উচিত যে, এই মহাযজ্ঞের নিমিত্ত সংগৃহীত এক কপর্দ্দকও বিচারবিরুদ্ধ রীতিতে ব্যয় না হয়। সংগৃহীত অর্থ যখন ধর্ম্মানুকূল রীতিক্রমে ব্যয় হইয়া থাকে, তখনই ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীলক্ষ্মীর পূর্ণ কৃপা হইয়া থাকে, এবং তখন ধনের অভাব কখনও থাকে না। অতএব এই বিরাট্ সভার কোষসমূহের এরূপ রক্ষা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরই জাতীয় কোষের সুরক্ষা এবং তাহার সদ্ব্যয় বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া যায়, তাহার আয়ব্যয়ের সংক্ষেপ হিসাব সাধারণতঃ প্রকাশিত হয়, এবং বিশেষতঃ সকল দাতার নিকট তাহা উপস্থিত হইতে পারে। যে ধর্ম্মবিভাগের নিমিত্ত যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত সম্ভব হয় সেই ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় হয়, প্রত্যেক আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প হয়, অধিক ব্যয় না হয়, এবং কার্য্যকর্ত্তৃগণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কৃপাপ্রাপ্তির প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করেন, এইপ্রকার করিলে দ্রব্য-শক্তির পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে।

ক্রিয়াশক্তির উন্নতির নিমিত্ত কতকগুলি বিষয়ের বিচার রাখা উচিত। নিয়ম-বদ্ধ অনুশাসন-ব্যবস্থার (organization) মূল মন্ত্রই এই যে, ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ কার্য্যকর্ত্তা পর্য্যন্ত এবং ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ কার্য্যালয় পর্য্যন্ত যথাক্রমে একে অপরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন, এবং প্রত্যেক কর্ত্তার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতার সম্বন্ধে পুরস্কার এবং তিরস্কারের রীতিও যথাক্রমে কার্য্যে পরি-ণত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কার্য্যকর্ত্তাদিগের যোগ্যতা এবং ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারাই কার্য্যের উন্নতি হইয়া থাকে; ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, যথাযোগ্য সভ্য মহোদয়গণকে যথাযোগ্য কার্য্যাধিকার-পদ দিলেই এই মহাযজ্ঞের পুষ্টি হইতে পারিবে, কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, যথাক্রমে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রণালী এবং তিরস্কার-পুরস্কারের প্রণালী দৃঢ়তর নিয়মের সহিত স্থায়ী রাখিলে অবশ্যই সফলতা লাভ হইয়া থাকে, এবং অযোগ্য পাত্রও কালান্তরে যোগ্যপাত্র রূপে পরিণত হইয়া যায়।

যেরূপ মনুষ্যের বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থা এইরূপ চারি অবস্থা আছে, ঐরূপ মনুষ্যজাতিরও চারিটী অবস্থা হইয়া থাকে। এবং ঐ

সকল অবস্থা অনুসারে ধর্ম্মীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মপুরুষার্থেরও পরিবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এবং যে প্রকারে কায়াকল্প করিয়া মনুষ্য জরাগ্রস্ত শরীরের পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নূতন শরীর পাইতে পারে, ঐপ্রকার সুকৌশলপূর্ণ নিয়মবদ্ধ অনুশাসনব্যবস্থা (organization) দ্বারা মনুষ্যজাতিও নূতনশক্তি লাভ করিতে পারে। আর্য্যজাতির এ সময় জরাগ্রস্ত অবস্থা। উহার কায়াকল্প করিতে হইবে। এ সময়কার প্রথম অবস্থায় করণীয় পুরুষার্থের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল। ক্রমে আর্য্যজাতির নূতন জীবনে ক্রমশঃ যেরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, নিয়মবদ্ধ অনুশাসনের নিয়মেও ঐরূপ ক্রমশঃ যথাবশ্যক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ এই মহাযজ্ঞের কার্য্যকলাপবিধিতেও ক্রমশঃ কিছু পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইবে। পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ক্রিয়াশক্তির নিয়মগুলিতেই প্রধানতঃ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং লোকসংগ্রহের ব্যবস্থায় ক্রমশঃ উদারতাবৃদ্ধি করিতে হইবে। উদাহরণরূপে বলা যাইতেছে, যথা—এ সময় স্থায়ী প্রতিনিধি এবং অস্থায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের যাহা বিধি আছে, শিক্ষাবৃদ্ধির সহিত উহা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। ক্রমশঃ সাধারণ প্রজা যাহাতে সঙ্ঘশক্তির সহিত অধিকরূপে অনুপ্রাণিত হইতে পারে, শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং ক্রমশঃ ঐ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য এই মহাযজ্ঞের নিয়মের পরিবর্ত্তন করিলে তবে এই মহাযজ্ঞ অধিক রূপে ফলবান্ হইবে। আর্য্যজাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ উহার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে, সেইরূপে স্বজাতীয়-মহাশক্তিপ্রবর্ত্তক এই মহাযজ্ঞের নিয়মাবলীতেও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যকীয় হইবে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মহাযজ্ঞের নেতৃবৃন্দ উক্ত পরিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতি করিয়া লইতে পারিবেন।

পদার্থবিশেষের ঘাতপ্রতিঘাতে যেপ্রকার তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই নিয়ম অনুসারে মনুষ্যজাতিগত শরীরেও নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থা দ্বারা পারস্পরিক সহযোগিতা হইতে ভগবদ্‌বিভূতিস্বরূপ পুরুষার্থরূপী মহৎ শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং পুনশ্চ দ্রব্যশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি এই তিন শক্তির অথবা প্রধানতঃ কোন দুই শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে এই মনুষ্যজাতিগত পুরুষত্বশক্তি (ক্রিয়াশক্তি) চিরস্থায়ী থাকিতে পারে। ক্রিয়া-

শক্তিকে জীবিত রাখিবার জন্য সংসারসুখেচ্ছু ব্যক্তিগণ দ্রব্যশক্তির সহায়তা-প্রাপ্তির বাসনা দ্বারা উক্ত ক্রিয়াশক্তির সংবর্দ্ধন করিতে থাকিবেন, এবং নিষ্কাম-ব্রতধারী জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন সাধুগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন হইয়া ক্রিয়াশক্তির পুষ্টি সাধন করিতে থাকিবেন। কিন্তু যখন তিনপ্রকার শক্তির একাধারে সমাবেশ হইয়া থাকে, এবং যখন তিনপ্রকার অধিকারীর পুরুষার্থ একই লক্ষ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিয়োজিত হয়, তখনই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। যখন সাধকগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া থাকেন, যখন ধর্ম্ম-লক্ষ্য দ্বারা যুক্ত হইয়া কার্য্যকর্ত্তৃগণ আপন আপন কার্য্যে পূর্ণরীতিক্রমে তৎপর হন, এবং যখন নিষ্কাম ব্রতকেই সকল অধিকারী শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে থাকেন, তখনই ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা দেব শ্রীবিষ্ণু ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যেপ্রকার কার্য্য হউক, সকল কার্য্যই পরোপকারভাব এবং জগৎকল্যাণ-বুদ্ধির দ্বারা সম্পাদন করিলে ভগবৎকার্য্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকল সময় কর্ত্তব্যকার্য্যে পরমার্থবুদ্ধি রাখিয়া উদ্যমশীল থাকেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে ভগবদ্ভক্ত। পরমতত্ত্বদর্শী মুনি-দিগের সিদ্ধান্তানুসারে জগৎহিতকর কর্ম্মই সাক্ষাৎ কার্য্যাত্মা পরমব্রহ্ম; এই নিমিত্ত কার্য্যাত্মা পরমব্রহ্মের অহৈতুক সেবা করাই ব্রহ্মোপাসনা, এবং এইরূপ কার্য্যাত্মা ব্রহ্মে সর্ব্বদা লয় হইয়া থাকাই জীবন্মুক্তি *। এইরূপ পূর্ব্বলক্ষণযুক্ত মহাপুরুষদিগের দ্বারাই যথার্থরূপে জ্ঞানশক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই করাল কলিকালে এরূপ আদর্শ-জীবন মহাপুরুষদিগের নিতান্তই অভাব হইয়া গিয়াছে। তথাপি যদি আর্য্যজাতি এখনও আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে যত্নবান্ হয়, তবে এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জ্ঞানশক্তিযুক্ত মহাপুরুষদিগের অভাব না হইবারই সম্ভাবনা।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক এবং জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ। অতএব আর্য্যজাতি ভগব-দুন্মুখ এবং ধর্ম্মেচ্ছুক হইলে আপনা আপনিই সেই জ্ঞানশক্তি প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তত্ত্বদর্শী মুনিদিগের ইহাও সিদ্ধান্ত যে, দ্রব্য-শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি যদি সুকৌশলপূর্ণ রীতি অনুসারে ধর্ম্মানুকূল নিয়োজিত করা যায়, তবে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য্যকর্ত্তৃগণের মধ্যে আপনা আপনিই

* অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥ (ইতি মহাভারতে ভীষ্মস্তবরাজে)

জ্ঞানশক্তি প্রকাশিত হইয়া যায়। যখন সংগৃহীত দ্রব্যের ধর্ম্মানুকূল ব্যয় করিবার জন্য দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া কার্য্যকর্ত্তৃগণের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবেন, যখন ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তির নিমিত্ত কর্ত্তৃগণ সাত্ত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সকলে একলক্ষ্য হইয়া লোককল্যাণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, যখন সকল সভ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া, রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বিষয়ের চিন্তায় তৎপর হইবেন, তখন সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা অবশ্যই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ করিয়া তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকিবেন। ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপান-আদি দেশসমূহে, যথায় তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদিগের অভাব আছে, তত্রত্য লোকহিতকর ধর্ম্ম-পুরুষার্থ-বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ এই রীতি অনুসারেই হইয়া থাকে। যখন কলিযুগে সংঘশক্তিই ভগবৎ-শক্তি, তখন এই সময়ে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন মনুষ্য-সংঘের মধ্যে ভগবৎ-সহায়-রূপ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি এবং জ্ঞানশক্তির বিকাশ করিবার জন্য আর এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ভক্তিমান্ সভ্যদিগের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে এক গুপ্ত আনুষ্ঠানিক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিয়মিতরূপে এই জাতির উৎপত্তির জন্য শাস্ত্র-সিদ্ধ অনুষ্ঠান করাইতে হইবে। একপ্রাণ একমন হইয়া ঐ সকল ব্যক্তি ঐ দৈবকার্য্য করিলে অবশ্য সফলতা হইবে। এবং ইহাও শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানানুকূল যে, ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বলিয়া ইহার অধিবাসীরা যদি প্রমাদনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মপরায়ণ হন, তবে তাঁহাদিগের সহায়তার নিমিত্ত পরোপকারব্রতধারী জীবত্রিতাপহারী, সর্ব্বলোক-হিতকারী এবং পরমার্থের নিমিত্ত আপন জীবনধারী মহাত্মাদিগের সহায়তাও অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কারণ, এরূপ সাধু মহাত্মারাই জগদীশ্বরের প্রতিনিধি *।

* অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণং শিবম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্‌বিভ্যতোঽরণম্॥

জগতে কোন নব্য মনুষ্যজাতির উৎপত্তি এবং অভ্যুদয় হওয়া স্বতন্ত্র কথা এবং কোন প্রাচীন জাতির বিকৃত অবস্থায় পুনরাবৃত্তি হইয়া তাহাদিগের পুনরভ্যুদয় হওয়াও স্বতন্ত্র কথা। প্রাচীন-সংস্কাররহিত কোন মনুষ্যজাতির ক্রমোন্নতি কোন কারণবিশেষে হইতে পারে, কিন্তু অনাদিসিদ্ধ প্রাচীন হইতে অতি প্রাচীন সংস্কারের সহিত যুক্ত, অধঃপতিত আর্য্যজাতির পুনরভ্যুত্থান করাইবার নিমিত্ত কিছু বিশেষ যত্নের আবশ্যকতা হইবে। যে যে কারণে বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় জাতিসমূহ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, কেবল সেই সকল কারণে আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয় হওয়া সম্ভব নহে; কেবল পাশ্চাত্য অনুকরণে এই প্রাচীন জাতি উন্নত হইতে পারিবে না। নূতন জাতিসমূহের নিমিত্ত কোন বিশেষ বিচারের আবশ্যকতা নাই; যেরূপ দেশ-কালের অবস্থা এবং পাত্রসমূহের প্রকৃতি, তদনুসারে সুকৌশলপূর্ণ নিয়মের উপর নূতন জাতিকে পরিচালিত করিতে থাকিলে নূতন জাতিসমূহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ইউরোপীয় জাতির কোন প্রাচীন আদর্শ নাই, ঐ সকল জাতির অন্তঃকরণকে সংস্কারবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাদের সম্মুখে কোন প্রাচীন দৃঢ় সংস্কার উপস্থিত ছিল না, এই নিমিত্ত স্বতঃই আপন আপন স্বভাবের উপর ঐ সকল জাতি আধিভৌতিক উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয় আরও অন্য প্রকারের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করিতেছে। এই অতি প্রাচীনজাতি আপনার অতি প্রাচীন সংস্কারসমূহের দ্বারা এইপ্রকার আবদ্ধ আছে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির পিতামহরূপী এই আর্য্যজাতি আপনার এক অলৌকিক ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত এবং বৈজ্ঞানিক ভাবসমূহের তীব্র সংস্কারের দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত আছে যে, সেই সকল ব্যতীত এই জাতির স্থিতি এবং উন্নতি অসম্ভব। যেমন, যদি কোন মনুষ্য কোন কারণে পড়িয়া যায়, তবে সে যে ভূমিতে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, উঠিবার সময়ও সে সেই ভূমির সহায়তায়ই উঠিতে সক্ষম হইবে।

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্তো ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥
বিচ্ছিন্নগ্রন্থয়স্তজ্জ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তে হ্যুপায়া ভবাম্বুধৌ॥
(ইতি পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস)

সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির যে অনাদিসিদ্ধ ধর্ম্মসিদ্ধান্ত তাহার সকল সময়ে সাথী হইয়া আছে, সেই ধর্ম্মসংস্কারের অবলম্বনেই এই জাতি পুনরভ্যুত্থিত হইতে পারিবে, অন্যথা তাহার উন্নতি হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব।

পাশ্চাত্য বিদ্যার দ্বারা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের এরূপ বিচার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা এই জাতিকে ধর্ম্মরহিত করিয়া উন্নত করিতে চাহেন; এবং তাঁহারা বলেন যে, সনাতনধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় এবং নানা পন্থাদির মত-ভেদই এই জাতিকে এরূপ অধঃপতিত অবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে, অতএব ধর্ম্মের উপেক্ষা করা ব্যতীত এই জাতি কদাপি পুনরুন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না!! এইপ্রকার ব্যক্তিদিগের এই প্রমাদযুক্ত সিদ্ধান্ত কিরূপ সর্ব্বথা নিন্দনীয়, অকীর্ত্তিকর, অদূরদর্শিতাপূর্ণ এবং অসত্য, তাহা পূর্ব্বকথিত অকাট্য যুক্তি-সমূহের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। অপিচ আর্য্যজাতির মধ্যে ধর্ম্মগত মত-পার্থক্য হইতে এই জাতির বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। অবশ্য ইহাতে সন্দেহ নাই যে, অজ্ঞতানিবন্ধন মতপার্থক্যের অবলম্বন হইতে যে রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু এই হানির প্রধান কারণ সাম্প্র-দায়িক মতভেদ নহে। তবে ঘোর অমঙ্গলকারী অজ্ঞানই উহার প্রধান কারণ। বিদ্যার প্রচার এবং নিয়মিত উপদেশ দ্বারা অজ্ঞান দূর হইলেই সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্মমত, এবং সকল ধর্ম্মপন্থ, ঐক্য সংস্থাপনপূর্ব্বক আপনার আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারে। এসময় ইউরোপ এবং আমেরিকায় যতপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতপার্থক্য আছে, সেরূপ কুত্রাপি নাই। পদার্থবিদ্যার (সায়েন্স) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় জাতির ধর্ম্মসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ মতভেদ হইয়া গিয়াছে। আদি খৃষ্টধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রথমতঃ অগণিত খৃষ্টধর্ম্মপন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়তঃ পদার্থবিদ্যার কৃপায় প্রায় শিক্ষিত পাশ্চাত্যপ্রজা একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া ইচ্ছানুরূপ আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে কোন সজ্জন ইউরোপীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা ভালরূপে জানেন যে, এ সময় যদি এরূপ বলা যায় যে, ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজে যত ব্যক্তি আছেন, তত ধর্ম্মমত আছে, তবে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। তবুও ঐ জাতিদিগের মধ্যে "সংঘ-শক্তির" অসাধারণ উন্নতি এবং ঐ সকল

জাতির অসাধারণ লৌকিক অভ্যুদয় যাহা হইতেছে, তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িক মতভেদ কোন জ্ঞান-পক্ষপাতী মনুষ্যজাতির ক্ষতি করিতে পারে না। যেপ্রকার সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন বাদ্যাগারে বহুপ্রকার যন্ত্র স্বরূপতঃ এবং শক্তিতঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও যখন সকলগুলিই এক লক্ষ্যযুক্ত হইয়া কোন এক রাগ অথবা রাগিণী বাজাইতে তৎপর হয়, সেই সময় উহাদিগের সমষ্টিকার্য্য একরূপ হইয়া যায়, সেইপ্রকার জ্ঞানপ্রচার এবং নিয়মবদ্ধতা (discipline) এবং অনুশাসনব্যবস্থা (organization) দ্বারা অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত আর্য্য-প্রজা একরূপ হইয়া আপন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় নিমিত্ত সফলকাম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীতরসিক সজ্জনবর্গ প্রায় ইহা অনুভব করিতে পারিবেন যে, যখন কোন সময় নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র কোন এক স্বরবিশেষে মিলাইয়া রাখা যায়, তবে সেই সময় সেই বিভিন্ন যন্ত্র হইতে কোন একটী যন্ত্র বাজাইলে সকল যন্ত্রই সজীব প্রাণীর ন্যায়, সেই একস্বরেই বাজিতে থাকে। ফলতঃ সমগ্র আর্য্যজাতিকে নিয়মবদ্ধ করিয়া এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করিলে সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, সকল সম্প্রদায়, সকল পন্থ, সকল অধিকারের ব্যক্তিই নিযন্ত্রিত হইয়া যাইবে। এবং সকলে একবাক্য এবং একপ্রাণ হইয়া অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের অধিকারী হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

কাল পিতৃস্বরূপ। পিতৃসেবার দ্বারা যেপ্রকার পিতৃদেবের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলে, পুত্র সকলপ্রকার কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পৈতৃক বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার কালক্রমে প্রাকৃতিক প্রবাহের অনুকূলে চলিলে মনুষ্য সকলপ্রকার অভ্যুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং কালের বিরুদ্ধে চলিলে বিপত্তি এবং বিফলতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ আর্য্যজাতিরও আপন সদাচার, আপনার সদ্ভাব এবং আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিতে করিতে কালপ্রবাহের অনুকূল আত্মোন্নতি করা কর্ত্তব্য। আপনার আর্য্যজাতিভাবকে মুখ্য রাখিয়া, এবং অন্য জাতির অনুকরণ করা নিন্দনীয় বুঝিয়া, কেবল অন্যান্য জাতিতে কালানুরূপ যে যে অভ্যুদয়কারী গুণ আছে, সেই সকলের সংগ্রহ করা নিতান্ত উচিত। জ্ঞানবৃদ্ধির বিচারে যেখানে যে কিছু বিদ্যা-বৃদ্ধিকারী শাস্ত্র অথবা উপদেশ আছে, উহাদিগের যথাযোগ্য সংগ্রহ করা সর্ব্বথা হিতকর হইবে। বিশেষতঃ এই

বর্ত্তমান কালপ্রবাহে প্রবাহিত পৃথিবীর অপর অপর আধিভৌতিক উন্নতিসম্পন্ন জাতিসমূহ যে প্রকারে আপনার দেশ এবং আপনার জাতির লৌকিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই উদাহরণে তাঁহাদিগের গুণসমূহ সংগ্রহ করিয়া আর্য্যজাতিরও বর্ত্তমানকালোপযোগী আধিভৌতিক উন্নতি করিবার জন্য যথাশক্তি যত্ন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। সুতরাং যে কোনপ্রকার লৌকিক হিতকর শাস্ত্রই হউক, অথবা জ্ঞানই হউক, উহার সংগ্রহ করিবার পক্ষে আর্য্যজাতির পশ্চাৎপদ হওয়া কদাপি উচিত নহে।

যেপ্রকার অন্য ধর্ম্মমতসমূহের নেতৃগণ পদার্থবিদ্যা (সায়েন্স) আদি জ্ঞানের বৃদ্ধির দ্বারা ভয়ভীত হইয়া থাকেন, সেইপ্রকার সনাতন ধর্ম্মের নেতৃবর্গের ভয়ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। নূতন পাশ্চাত্য দর্শন এবং পদার্থবিদ্যার উন্নতিতে অন্যান্য ধর্ম্মমতসমূহের ভিত্তি যেপ্রকার শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং যেপ্রকার এক্ষণে উক্ত (সায়েন্স) শাস্ত্রসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে অন্য ধর্ম্মমতসমূহের নেতৃগণ দিন দিন চিন্তার দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছেন, সেই প্রকারের দুর্ব্বলতা সনাতন-ধর্ম্মের নেতৃবর্গের হৃদয়ে উৎপন্ন হইতেই পারে না। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-রহিত অন্য ধর্ম্মমতসমূহ নূতন পাশ্চাত্য দর্শন এবং পদার্থবিদ্যা-সমূহের সম্মুখে শ্রীহীন হইয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু অভ্রান্তসিদ্ধান্তযুক্ত বৈদিক বিজ্ঞানের উপর অবস্থিত এবং পূর্ণজ্ঞানযুক্ত বৈদিক দর্শনশাস্ত্রসমূহের দ্বারা সুদৃঢ় সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ে এরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। বরং যতই জ্ঞানরাজ্যের উন্নতি হইবে, ততই সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি সাধিত হইবে।

স্থূলপদার্থ-সমূহের সুকৌশলপূর্ণ সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা আধিভৌতিক-শক্তি-উৎপাদনকারী পদার্থবিদ্যার (science) গতি স্থূল রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া, সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের প্রথম সীমা পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং তৎপশ্চাৎ সূক্ষ্ম দার্শনিক অধিকার প্রারম্ভ হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত এই ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা পূর্ণ সনাতনধর্ম্মবিজ্ঞানের গতিও স্থূলাতিস্থূল বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তর্জগতের আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত অবস্থিত। বৈদিক দর্শনসমূহের মধ্য হইতে উচ্চ অধিকারের দর্শনসমূহের গতি, প্রকৃতিরাজ্যের চরমসীমা পর্য্যন্ত দেখা যায়; উহার অধিকার এতদূর পর্য্যন্ত উন্নত যে, তাহা

তত্ত্বাতীত পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করাইতে সহায়ক হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ক্রমশঃ যত স্থূল পদার্থরাজ্যের জ্ঞান এবং যত সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের বিজ্ঞান সংসারে প্রকাশিত হইবে, ততই সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট আনন্দের কারণ হইবে। দূরদর্শী মহাপুরুষদিগের ইহা সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবীর অন্য জাতিসমূহ ক্রমোন্নতি-প্রবাহানুসারে যতই পদার্থবিদ্যা এবং দার্শনিক জ্ঞানে অধিক হইতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া যাইবেন, ততই তাঁহারা অধ্যাত্ম-জ্যোতির প্রথম অবস্থাতে উত্থান করিয়া ক্রমশঃ উহার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন এবং ঐ সকল জাতি যতই আধ্যাত্মিক অধিকারে অগ্রসর হইয়া যাইবেন, ততই তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। যতই ঐ সকল জাতি বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া সত্য পদার্থের অনুভব করিবেন, ততই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ধর্ম্মপ্রবীণ আর্য্যজাতিই ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু। ফলতঃ এই বিরাট্ ধর্ম্মসভার নেতৃবৃন্দের, আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব এবং প্রকাশক পূজ্যপাদ সর্ব্বলোকহিতকারী মহর্ষিদিগের উদারতার পূর্ণ বিচার রাখিয়া সাবধান হইয়া সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্ব-ধর্ম্মমতের সহিত স্নেহভাবের বৃদ্ধি করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

প্রায় কালবাদী, প্রারব্ধপক্ষপাতী এবং পুরুষার্থহীন ব্যক্তিগণ এইপ্রকার শঙ্কার দ্বারা ধর্ম্মপ্রেমিকদিগের হৃদয় নিরুৎসাহপূর্ণ করিয়া থাকেন যে, কালের গতির বিরুদ্ধে কোনও পুরুষার্থ হইতে পারে না, আর্য্যজাতির প্রারব্ধই মন্দ হইয়া গিয়াছে, অতএব এ সময় সহস্র যত্ন করিলেও কিছুই হইবে না এবং এই ঘোর অধঃপতিত অবস্থা হইতে আর্য্যজাতিকে উত্থিত করিবার যত্ন করা সর্ব্বথা নিষ্ফল। বলা বাহুল্য, অজ্ঞান এবং প্রমাদই এই সকল শঙ্কার কারণ। শাস্ত্রকারগণ কালকে ঈশ্বর রূপে বর্ণন করিয়াছেন; কাল নির্লিপ্ত, কালের অন্ত-র্গত সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ক্রিয়া হইয়া থাকে, কিন্তু কাল ঐ সকল হইতে স্বতন্ত্র। এই ব্রহ্মাণ্ড কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু অনাদি অনন্ত কাল কাহার দ্বারাও পরি-চ্ছিন্ন নহেন। যেপ্রকার প্রকৃতির ত্রিগুণবিকার পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ঐ ত্রিগুণের বিকার হইতে সর্ব্বদা নির্লিপ্ত, সেইপ্রকার এক কালবিশেষে উৎপন্ন জীবসমষ্টির কর্ম্মের দ্বারাই কালের স্বরূপ ভাসমান হইতে থাকে, নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে কাল নির্লিপ্ত এবং নির্ব্বিকার। অতএব

মনুষ্যসমষ্টির প্রবল পুরুষার্থের দ্বারা ভাসমান কালধর্ম্মের যথ' হইতে পারে। হওয়া বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে। ।কবার কৃপাদৃষ্টি

প্রারব্ধবাদীদিগকে এই অকাট্য উত্তর দেওয়া যাইতে ।যে অধঃপতিত প্রারব্ধ আর কিছুই নহে, উহা কেবল তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষার্থ বার যোগ্য সময় হইয়াছে। ফলতঃ প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা প্রারব্ধের নিরাকর একদিন যে আর্য্য- এবং যে ব্যক্তি আর্য্যজাতির এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থ্যমাদ-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকেন, তাঁহার নিরুৎসাহ হওয়া কারণরহিত ।গাসিন্ধো! ইহার কর্ম্মবাদী আর্য্যজাতির কোন অবস্থাতেই আত্মোন্নতিতে নির :গর অশুভভোগের পায় না। যখন ইহা নিশ্চয় যে, জীবসমূহের কর্ম্মসমষ্টি হইকলের স্বাভাবিক উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহাও নিশ্চয় যে, শুভ এবং অশুভ ক তুমিই তাহার জীবসমূহের শুভ এবং অশুভ কর্ম্মসমষ্টির দ্বারাই সাধিত হয়, তবেছি। হে জ্ঞান- ষার্থে অমনোযোগ করা সর্ব্বথা নিন্দনীয় এবং বিচার-বি: দ্ধ। নিদ্রিত আর্য্য- ভগবানের অপার করুণার উপর বিশ্বাস রাখিয়া স্থিরবুদ্ধি -:ত থাকে। হে প্রবৃত্ত হইলে সফলতার সম্ভাবনা আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই সার্ব্বভৌম-দৃষ্টি-সম্পন্ন

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যেরূপই ক্ষুদ্র হইতে অতি :প্রজার হৃদয়ে বিকাশ হউক, কালান্তরে উহা হইতে ফলোদয় হওয়া একান্ত বি: রভক্ত আর্য্যসন্তান- আর্য্যজাতির বিফলতার সম্ভাবনা নাই; এ সময়ে হউক, অথব. মনোহর মূর্ত্তির দর্শন তাঁহাদিগের সমষ্টিকর্ম্মের ফল অবশ্যই তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন ।লিয়া স্বার্থপর এবং এক বারি বিন্দু হইতেই সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইপ্রক আলস্যের নিমিত্তই সন্তানের এক একটী সৎকর্ম্ম সংগৃহীত হইয়া সমষ্টিরূপে ভবিজগৎপ্রাণ! তাঃ উৎপত্তি হইবে। বস্তুতঃ যদি কোন আর্য্যসন্তান কোন সময়ে পবিত্র ভাব কেবল মনের দ্বারাই আপনার জাতির কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে তাঁহার সেই মানসিক কর্ম্মও ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তমকালের উৎপত্তির কারণ হইবে। ফলতঃ যদি সকল আর্য্যসন্তান শ্রীগীতোপনিষদ্-প্রকাশিত কর্ম্মযোগ-বিজ্ঞানের অনুভব করিতে যত্ন করেন, যদি সকল ভারতবাসী পূজ্যপাদ শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের আদেশ এবং এই মহাযজ্ঞের রহস্য বুঝিয়া আপনার সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি করিতে করিতে ধর্ম্মো- ন্নতি করিতে সমর্থ হন, যদি সকল বর্ণাশ্রমধর্ম্মী নিজ নিজ অধিকারে ভেদবুদ্ধির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলের সহিত প্রেমস্থাপনপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর

আর্য্যসন্তান ইহা বুঝিতে আরম্ভ করেন যে, স্বার্থপরতা এবং
গর অধঃপতনের কারণ, এবং যদি সকল আর্য্যসন্তান প্রতিদিন
দীশ্বরের চরণে আপন জাতির পুনরভ্যুদয় এবং ধর্ম্মোন্নতির
রিতে করিতে আপন আপন শক্তি অনুসারে এই মহাযজ্ঞ
ন্ন, তবে সকলপ্রকার কল্যাণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই
। ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অঙ্গই এই যে, যদি কোন আর্য্যসন্তান
রেন, তবে তাঁহার প্রতিদিন একবার জীবত্রিতাপহারী,
ী, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সমীপে সরল হৃদয়ে আর্য্যজাতির
করাও উচিতই হইবে।

স্বরূপ! যে

প্রার্থনা।

তেছেন।

থাকিতে ন্দ ব্রহ্ম! তোমাতে এবং আমাতে অভেদ হইলেও, হে হৃদয়-
বুদ্ধি কবি তোমারই। কারণ, হে জগদাত্মন্! তরঙ্গ ত সমুদ্রেরই হইয়া
কল্যাণকারী ময় জগদ্গুরো! আমি অল্পদর্শী জীব, কিন্তু তুমি সর্ব্বদর্শী,
কর। হে হে কৃপাসিন্ধো! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে প্রেরণা করিয়া
পুরুষার্থ এবং থার্থ জ্ঞানালোক প্রকাশিত করিয়া দাও। হে সর্ব্বনর-
গিয়াছে; যে র্ত্ত! হে বিরাট্ পুরুষ! তুমি প্রাণিমাত্রের উপর এরূপ
হইয়া থাকে র এই অংশসমূহ বিপথগামী না হইয়া তোমার আত্মস্বরূপের
এরূপ ধৃতির রিতে করিতে তোমার প্রতিই অগ্রসর হউক। হে মহাদেবী-
করিয়া দাও। তোমাতেই এই বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়া আছে, পুনরায়
উহা ক আর্য্যজাতি পুনঃ তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তুমিই জগতের
পিতা এবং মাতৃ চি। হে সর্ব্বলোকপিতামহ! মহাপ্রলয়ের অবসানে তুমিই
রজোগুণময় হইয়া অনন্ত-বৈচিত্র্যপূর্ণ এই অনন্ত সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়া থাক।
হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণময় হইয়া এই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী সৃষ্টি-লীলা
রক্ষা করিতেছ। হে মহারুদ্র! তুমি তমোগুণময় হইয়া এই অনন্ত-শোভা-
পূর্ণ সৃষ্টিপ্রবাহের লয় করিতেছ। হে জীবত্রিতাপহারি! জীবসমূহের হৃদয়ের
অবিনয় দূর কর, মন দমন কর, অসৎ বাসনা হইতে তাহাদের অন্তঃকরণ প্রত্যা-
বৃত্ত করিয়া সৎ-অনুগামী করিয়া দাও, যাহাতে পরস্পরে দ্বেষভাব ভুলিয়া উঁহারা

ভ্রাতৃভাবে পরস্পরে মিলিয়া তোমারই অনন্তমহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। হে জগৎপিতঃ! তুমি তোমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রগণের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর। যদিও এই আর্য্যজাতি আপনারই অসৎকর্ম্মসমূহের দোষে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার পতিতপাবন নামের সার্থকতা করিবার যোগ্য সময় এই সময় ব্যতীত আর কবে উদয় হইবে? হে ধর্ম্মরাজ! একদিন যে আর্য্যজাতি জগদ্‌গুরু এবং বিশ্ববিজয়ী ছিলেন, সেই জাতি আজি প্রমাদ-নিদ্রায় নিদ্রিত এবং জগতের নিকট ভিখারী হইয়া রহিয়াছে। হে করুণাসিন্ধো! ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি দণ্ড হইতে পারে যে, এখনও ইহাদিগের অশুভভোগের অন্ত হইল না। হে জগদীশ্বর! স্বভাবতঃই অহঙ্কারী জীবসকলের স্বাভাবিক গতি ত অসতের প্রতিই হইয়া থাকে, কিন্তু হে পতিতপাবন! তুমিই তাহার একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে স্মরণ করিতেছি। হে জ্ঞানমূর্ত্তে! এরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত কর যে, যাহা হইতে এই মোহনিদ্রায় নিদ্রিত আর্য্যসন্তানগণের অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইতে থাকে। হে জ্ঞানাত্মন্! সর্ব্বভূতমধ্যে অবিভক্তরূপ, বিকারহীন, সার্ব্বভৌম-দৃষ্টি-সম্পন্ন আধ্যাত্মিক-উন্নতিকারী যে সাত্ত্বিক জ্ঞান আছে, তাহা আর্য্যপ্রজার হৃদয়ে বিকাশ করিয়া দাও। হে ভক্ত-মনোমন্দির-বিহারি! আপনার চিরভক্ত আর্য্যসন্তানদিগের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক তাহাদিগকে তোমার এরূপ মনোহর মূর্ত্তির দর্শন করাও, যাহাতে হে হৃষীকেশ! তাহারা পুনরায় তোমাকে ভুলিয়া স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়লোলুপ হইতে না পারে। হে যজ্ঞেশ্বর! প্রমাদ এবং আলস্যের নিমিত্তই আর্য্যসন্তানগণ তোমার মহিমা ভুলিয়া রহিয়াছে, পরন্তু হে জগৎপ্রাণ! তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার পরম ভক্ত ছিলেন এবং এই পবিত্র ভারতভূমিই কর্ম্মভূমি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এরূপ কৃপা কর যে, যাহাতে তমোগ্রস্ত আর্য্যসন্তানগণ পুনঃ সচেষ্ট হইয়া কর্ম্মের অপার শক্তি বুঝিতে পারে। হে তপোমূর্ত্তে! তোমার মহিমা ভুলিয়া যাওয়াতেই ভারতবাসীদিগের এই দুর্গতি হইয়াছে, এরূপ করুণা কর যে, যাহাতে ইহারা দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া নিষ্কাম-ব্রতপরায়ণ হইতে পারে। হে দানমূর্ত্তে! যদিও আর্য্যসন্তানগণ এখনও প্রকৃতি হইতেই তোমার সেবা করিতে তৎপর আছে, কিন্তু তাহারা তোমার যথার্থস্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছে। হে কলিকল্মষনাশন! এরূপ প্রেরণা কর যে, যাহাতে তাহারা

...সেবায় রত হইতে প...

স্বরূপ! তোমারই কৃপায় ... ঋষিগণ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি ক...

তেছেন। তোমারই শক্তির দ্বারাই তাঁহারা ব্যবহারদশায় অবস্থিত থাকিতেও, তোমার প্রবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিতে করিতেও মোক্ষপ্রদ ধর্ম্মে বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন। প্রারব্ধবশে এক্ষণে তাঁহারা যে তোমার জগৎ-কল্যাণকারী স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে দর্শন করাইয়া কৃতার্থ কর। হে তেজঃস্বরূপ! অধঃপতিত চঞ্চলমতি ভারতবাসী আজ শৌর্য্য, বীর্য্য, পুরুষার্থ এবং তেজস্বিতা-আদি গুণাবলী বিস্মৃত হইয়া অলস এবং নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে; যে জ্ঞানপূর্ণ ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে এবং যে ধৈর্য্যশক্তি মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়াও অব্যভিচারিণীই থাকে, এরূপ ধৃতির উৎপত্তি করিয়া এই আর্য্যজাতির মধ্যে ক্ষাত্র তেজের আবির্ভাব করিয়া দাও। হে বিষ্ণুপ্রিয়ে মহালক্ষ্মি! তোমার অকৃপা হইতেই এই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি ধনধান্যহীন, বলহীন এবং শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। স্নেহময়ি মাতঃ! তোমার চির কৃপাপাত্র এই জাতির উপর পুনরায় এরূপ কৃপাদৃষ্টি কর যে, এই সময়ের উপযোগী বৈশ্যধর্ম্মের উন্নতি হইয়া এই ভারতবর্ষ পুনরায় তোমার লীলা-ভূমি হইতে পারে। হে বিশ্বকর্ম্মন্! যে দিন হইতে শূদ্রধর্ম্মাবলম্বীরা আপনা-দিগের সেবাধর্ম্ম এবং শিল্পবিদ্যা হইতে চ্যুত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর্য্য-জাতির অধঃপতন হইয়াছে। হে শিল্পিরাজ! ত্রিতাপতাপিত ভারতবাসীদিগের উপর এরূপ কৃপাদৃষ্টি কর যে, যাহাতে শিল্পোন্নতির দ্বারা ভারতবাসিগণ তোমার অতুলনীয় মহিমা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়। হে ধর্ম্মস্বরূপ! তুমি সকল জীবকে যথাযোগ্য অধিকারের উপর পরিচালনপূর্ব্বক সকলকে তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

চরণকমলে বার বার প্রণাম করিতেছি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

ইতি শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল-রহস্য সমাপ্ত।